CADENCE

ANNUAL MAGAZINE 2025

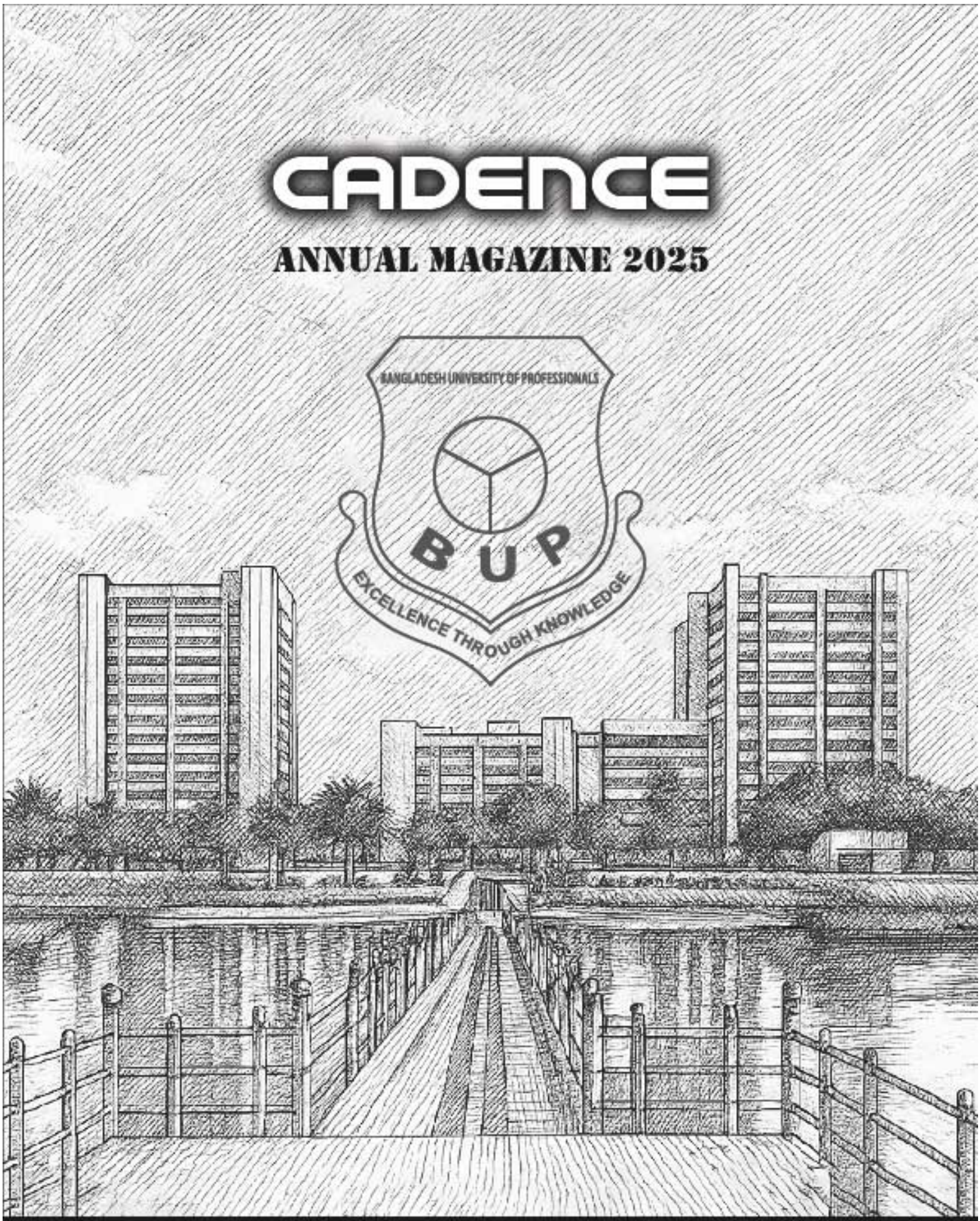

BANGLADESH UNIVERSITY OF PROFESSIONALS

Cadence

বিইউপি বার্ষিক ম্যাগাজিন-২০২৫

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতা	: মেজর জেনারেল মোঃ মাহ্‌বুব-উল আলম, বিএসপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল, পিএইচডি
প্রকাশকাল	: নভেম্বর ২০২৫
বার্ষিক প্রকাশনা	: ৮ম
প্রচ্ছদ অলংকরণ	: হেলাল উদ্দীন শাখা কর্মকর্তা, উপাচার্যের সচিবালয়
প্রকাশক	: বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)
সহায়তাকারী	: অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাডমিন অফিসার মোঃ রাজীব হোসেন কম্পিউটার অপারেটর মোঃ মঈনুল ইসলাম চৌধুরী কম্পিউটার অপারেটর মোঃ ফারুক হোসেন কম্পিউটার অপারেটর মাহমুদুর রহমান (ডিজাইন অ্যান্ড ক্যালিগ্রেশন)।

প্রকাশনায়

পাবলিক রিলেশন্স, ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিকেশন্স

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)

মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা-১২১৬

ফোন : +৮৮-০৯৬৬৬-৭৯০৭৯৯, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-২২৩৩৭৩১৯৭

ই-মেইল : info@bup.edu.bd, ওয়েবসাইট : www.bup.edu.bd

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মেজর জেনারেল মোঃ মাহবুব-উল আলম, বিএসপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল, পিএইচডি

উপদেষ্টা
অধ্যাপক খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন, পিএইচডি

প্রধান সমন্বয়কারী
এয়ার কমডোর ফেরদৌস মান্নান, বিপিপি, পিএসসি, এভিডব্লিউসি

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক
গ্রুপ ক্যাপ্টেন এস এম শাকির আহমদ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জিডি(পি)

ড. ফাহমিদা হক
অধ্যাপক

মোহাম্মদ শওকত ওসমান
অতিরিক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর
অতিরিক্ত পরিচালক

মেজর মমতাজ আলা শিকির আহমেদ (অবঃ)
উপ-পরিচালক (পাবলিকেশন্স)

মেজর সাবির আহমেদ, পিএসসি (অবঃ)
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (একাডেমিক সেকশন)

মেজর রোজিনা খন্দকার, এইসি
সহকারী অধ্যাপক

ড. মোঃ মোজাফিজুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

এ. এস. এম. সাদিকুর রহমান
সহকারী কলেজ পরিদর্শক

মেহেদী ছাজিদ খান
সেকশন অফিসার

বাণী

উপাচার্য
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

একবিংশ শতকের বর্তমান সময়ে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Artificial Intelligence (AI)-এর ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিকিৎসাক্ষেত্র, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষাক্ষেত্র, বাণিজ্য, যোগাযোগব্যবস্থাসহ সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য। তবে প্রযুক্তির অগ্রগতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ও বিস্তৃতি যতই সম্প্রসারিত হোক না কেন, মানুষের বুদ্ধিমত্তা বা সৃজনশীলতার তুলনায় তা খুবই নগণ্য। কারণ, প্রযুক্তির এই সকল অগ্রগতির পেছনের আবিষ্কারক হলো মানুষের মেধা, বুদ্ধিমত্তা, সৃজনশীলতা এবং নতুন কিছু সৃষ্টি করার অদম্য স্পৃহা। বিশ্ববিদ্যালয় হলো শিক্ষার্থীদের সেই জ্ঞানচর্চা, বুদ্ধিমত্তার বিকাশ, সৃজনশীলতা চর্চা ও অনুপ্রাণিত হবার সূতিকাগার।

বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক শিক্ষালাভ ও জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি একজন শিক্ষার্থী তার মানবিক মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতাবোধ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকবোধের পরিশীলন ঘটাতে পারে। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস শিক্ষার্থীদের মেধা, মনন, সৃজনশীলতা ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; কারণ আজকের শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের কর্ণধার। শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি তথা সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ তাদের সৃজনশীল সুকুমারবৃত্তি বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। *Cadence* শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, চিন্তাশক্তি ও সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের অন্যতম মাধ্যম। এই বার্ষিক ম্যাগাজিনে শিক্ষার্থীরা লেখার মাধ্যমে তাদের বুদ্ধিদীপ্ত চেতনা, জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ও শিল্পবোধের নান্দনিক প্রকাশ ঘটায়। তাদের লেখা গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা কিংবা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় থাকে সৃজনশীলতার ছোঁয়া। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, *Cadence*-এ প্রকাশিত রচনাসমূহ শিক্ষার্থীদের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটানোর পাশাপাশি পাঠকহৃদয়কে আলোড়িত করবে।

পরিশেষে, বার্ষিক ম্যাগাজিন *Cadence* প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মেজর জেনারেল মোঃ মাহবুব-উল আলম, বিএসপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল, পিএইচডি

বাণী

উপ-উপাচার্য
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

Cadence-এর অষ্টম প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন!

বিইউপির শিক্ষার্থীদের একাডেমিক জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার লক্ষ্যে *Cadence* ম্যাগাজিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই ম্যাগাজিনটির অষ্টম সংস্করণ প্রকাশনার মাধ্যমে বিইউপির শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষার্থীরা মননশীল ও সৃজনশীল জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে শিক্ষাকার্যক্রমের পাশাপাশি নাগরিক দায়িত্ব পালনে তাদের মধ্যে নানাধরনের মানবিক ও মূল্যবোধ সম্বলিত শিক্ষার প্রতিফলন ঘটাবে বলে আশা করছি। এছাড়াও নানা দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনি ও নানাবিধ লেখনিতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ বড় ধরনের অবদান রেখে চলেছেন যা এদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল-বিষয়ক সামগ্রিক মূল্যবোধ সমুন্নতের লক্ষ্যে পরবর্তী প্রজন্মকে সৃজনশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। জ্ঞানের নিত্য-নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার লক্ষ্যে এ ম্যাগাজিনের মাধ্যমে বিইউপি পরিবার ভবিষ্যতে দেশীয় সংস্কৃতি বিকাশে অধিকমাত্রায় সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে সক্রিয় হবেন – এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

এ প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভকামনা! আমি এ ম্যাগাজিনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করছি।

অধ্যাপক খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন, পিএইচডি

প্রধান সমন্বয়কারীর বাণী

প্রধান সমন্বয়কারী
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি নৈতিকতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর এই যান্ত্রিক সভ্যতায় শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা শিক্ষার্থীদের মননশীল মানসিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য। এই প্রক্রিয়ায় অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এর বার্ষিক ম্যাগাজিন *Cadence* গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। *Cadence* ম্যাগাজিন শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ভাবনা ও কল্পনার প্রতিবিম্বিত রূপ পাঠকের সামনে তুলে ধরে।

বিদ্যায়তনে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হওয়া স্বপ্ন, কৌতূহল এবং আশার প্রতিচ্ছবি এই বার্ষিক ম্যাগাজিন, যেখানে যাত্রার পদচিহ্ন, সৃষ্টির উল্লাস ও ভাবনার দায়বদ্ধতা রয়েছে। বিইউপির শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণ রচিত গল্প, কবিতা, নিবন্ধ ও গবেষণাধর্মী রচনায় ফুটে উঠেছে বর্তমান প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গি যারা নৈতিকতা, সংস্কৃতি ও দায়িত্ববোধে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। *Cadence*-এ প্রকাশিত লেখাসমূহ শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী চিন্তাধারা বিকাশের পাশাপাশি মানবিকতাবোধ ও সুকুমারবৃত্তি চর্চায় অনুপ্রাণিত করবে।

পরিশেষে, *Cadence* প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, ও কর্মচারীদের প্রতি জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় এ প্রকাশনা আরও সমৃদ্ধ হবে বলে আমি আশাবাদী।

এয়ার কমডোর ফেরদৌস মান্নান, বিপিপি, পিএসসি, এডিডব্লিউসি

সম্পাদকীয়

প্রধান সম্পাদক
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যজ্ঞান নয়, বরং তাদের চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা, মানবিক মূল্যবোধ ও নেতৃত্বগুণ বিকাশে বিশ্বাসী। প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা শিক্ষার্থীদের মানবিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য। এই প্রকাশনাটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈতিক আদর্শ, একাডেমিক উৎকর্ষ এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। এরই প্রেক্ষাপটে *Cadence* ম্যাগাজিন শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রকাশ ও কল্পনার এক সৃজনমঞ্চ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রতিবছর *Cadence*-এর মাধ্যমে বিইউপির শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন চিন্তা, সৃজনশীল ধারণা এবং মানবিক চেতনার প্রকাশ ঘটায়। এই ম্যাগাজিনের প্রতিটি লেখা আমাদের শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি, সুগভীর চিন্তা এবং অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের এক অনন্য বহিঃপ্রকাশ। শিল্প ও সাহিত্যচর্চার সঙ্গে একাডেমিক চর্চার সমন্বয়ে গঠিত এই সাংস্কৃতিক সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে পাঠকের মনে নান্দনিকতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। আমি বিশ্বাস করি, এই ম্যাগাজিন শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের পাশাপাশি কর্মস্পৃহা ও উদ্ভাবনী চিন্তাধারাকে আরও শক্তিশালী করবে। এটি তাদের ভবিষ্যৎ পেশাজীবনে সাফল্যের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে অবদান রাখতে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

পরিশেষে, *Cadence* প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের প্রতি জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তাদের নিরলস পরিশ্রমে এ প্রকাশনা নতুন মাত্রা পাবে বলে আমি আশাবাদী।

গ্রুপ ক্যাপ্টেন এস এম শাকির আহমদ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জিডি(পি)

BANGLADESH UNIVERSITY OF PROFESSIONALS
B U P
EXCELLENCE THROUGH KNOWLEDGE

সূচিপত্র
বিইউপি ম্যাগাজিন-২০২৫

ক্র/নং	শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা নং
০১	Selection Criteria for University Teachers: Building the Foundation of Quality Education	Major General Md Mahbub-ul Alam	০১
০২	Bangladesh University of Professionals (BUP): Accreditation and Quality Education	Major General Mohammad Quamruzzaman (retd)	০৪
০৩	Strengthening Universities Through Media: A Perspective	Air Commodore Ferdous Mannan	০৭
০৪	Student Responsibilities from the Beginning of University Life: Building Foundations for National and Global Contribution	Tahmina Sultana	০৯
০৫	Marketing for Socialization: the Art of Being a Good Friend	Ashik Abdullah	১২
০৬	Stronger Together: Ending Ragging through Awareness and Action	Niamat Ullah	১৪
০৭	Are We Good Citizens? A Simple Test	Meherin Ahmed Roza	১৬
০৮	Blockchain Technology in Public Administration: Prospects and Challenges	Anas Al Masud	১৮
০৯	Wi-Fi in the Haor	Rifa Tasnia	২০
১০	Walking Through Mughal Memories: A Family Journey to India	S M Nazmus Sakib	২২
১১	Aspiration vs Sooth: The Chronicle of Real-Life Stoicism	Jannateen Naoar Siena	২৪
১২	SAUFEST 2020: More Than Just a Fest	Muhammad Nafis Shahriar Farabi	২৬
১৩	Marketing: The Art of Psychology	Israt Jahan Dina	২৯
১৪	Freedom of Speech or Hate Speech: How Do We Draw the Line?	Md. Tanvir Mahtab	৩১
১৫	Where They Live	Faria Binte Yousuf	৩৩
১৬	In Praise of Ordinary Days	Rasel Mahamud	৩৪
১৭	Graduate Anxiety: Life Beyond Graduation in an Uncertain Job Market	Umama Baida	৩৬
১৮	Murder, Dinner, and Other Problems	Lum Yea Hossain Ankona	৩৮
১৯	Zero-waste Lifestyle: Can Students Really Do It?	Fyruz Yazdani Shukria	৪০
২০	Anecdotes of Ultimate Odyssey	Nafisa Tabassum Maisha	৪২
২১	Adventure in the Sundarbans	Ummay Muktazun Sobhan	৪৩
২২	Nomads Along the Sea	Fateema Tuz Zahra	৪৪
২৩	Decolonising Education in Bangladesh: Rethinking Curriculum and Knowledge	Zahra Anjum	৪৬
২৪	The Cartographer of Clouds	Mst. Fatema Binta Alam Jim	৪৮
২৫	Rising Tides	Azmaine Faeique	৪৯
২৬	When the Little Stars Fell	Mst. Nusrat Jahan Suchi	৫০
২৭	From Desk to Dais	Ridwana Islam Ruhama	৫১
২৮	The Uniform That Stands	Md Rafidul Islam	৫২
২৯	A Spark of Magic	Shurovi Akter	৫৩
৩০	The River's Path from Sunrise to Sunset	Mohammad Fahim Faysal	৫৪
৩১	Dear Aphrodite,	Yousha Andalib	৫৫
৩২	The Green Horizon of BUP	Asib Al Arafat	৫৬

সূচিপত্র
বিইউপি ম্যাগাজিন-২০২৫

ক্র/নং	শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা নং
৩৩	কীভাবে সুখী হওয়া যায়?	মেজর শামীম সাখাওয়াত	৫৭
৩৪	অনিন্দ্যসুন্দর দ্বীপদেশে স্বপ্নময় পাঁচ দিন	মোছাঃ দিলশাদ শারমিন চৌধুরী	৬০
৩৫	একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের ডায়েরির অংশবিশেষ	এ. এস. এম. সাদিকুর রহমান	৬৪
৩৬	লরেন্স লেমিউ : অলিম্পিকের পদকবিহীন কিংবদন্তি	সঞ্জয় বসাক পার্থ	৬৭
৩৭	স্রষ্টার রাহে মুসাফিরের যাত্রা	তোফায়েল আহমেদ	৬৯
৩৮	বৃদ্ধাশ্রমে জীবন : সমাজের ব্যর্থতা নাকি পারিবারিক অবহেলা?	জান্নাতুল বাকিয়া জেনি	৭৩
৩৯	ব্যাকবেঞ্চার	হেলাল উদ্দীন	৭৬
৪০	স্বপ্ন তবুও সত্য	প্রলয় মুখার্জী	৭৯
৪১	ক্যাম্পাস থেকে কর্পোরেট : পেশাগত জীবনের ভিত্তি গড়া	শেখ মোঃ অনিক হাসান রাব্বি	৮১
৪২	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবট অধিকার : নৈতিকতা, আইনি কাঠামো ও বিতর্ক	মালিহা তাবাস্‌সুম	৮৩
৪৩	চায়ের কাপে শিক্ষা!!!	মেহেদী ছাজিদ খান	৮৬
৪৪	ঘরে ফেরা কিংবা ঘরছাড়ার তাড়া	ফাহমিন চৌধুরী	৮৮
৪৫	পুরুষতন্ত্রের অন্তরালে	জান্নাতুল ফেরদৌস ইতি	৯০
৪৬	অন্ধকার ভেদ করে আলোর পথ	মোঃ মুহাইমিন মুন	৯২
৪৭	পুস্তকে প্রাণরস	লামিয়া পারভিন অরিন	৯৫
৪৮	মা	এস এম নাফিজ উল আলম	৯৭
৪৯	নামের আগে ডাক্তার	রুবাইয়া বিনতে রকিব	৯৯
৫০	এক টুকরো পাউরুটি	ইমরানুল হক চৌধুরী	১০১
৫১	বাঁচতে দাও	সাদিয়া তাসনিম	১০৩
৫২	দশ টাকার স্মৃতি	মোঃ শাহরিয়ার রাব্বি	১০৪
৫৩	অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা	ইফাতারা ইরা	১০৫
৫৪	অদৃশ্য শৃঙ্খল	অর্ঘ্য প্রতীক চৌধুরী	১০৭
৫৫	শারদপ্রভা	আরেশা আহমেদ রিদি	১১০
৫৬	মনন	নাকিব জামান	১১১
৫৭	মৃত্যু	মোহাম্মাদ ইলিয়াস কবির	১১২
৫৮	গাছের অব্যক্ত কথন	মোঃ মশিউর রহমান অন্তর	১১৩
৫৯	আমি নারী	সোহানা আক্তার রিয়া	১১৪
৬০	কাছে লোকে কিছু বলে	মোরসালিন মাহফুজ	১১৫
৬১	মিতালি	ফারদীন-ই-হাসান ফুয়াদ	১১৬

Selection Criteria for University Teachers: Building the Foundation of Quality Education

Major General Md Mahbub-ul Alam
Vice Chancellor, BUP

There is a great saying, "A good education can change anyone. A good teacher can change everything." In every society, teachers are regarded as the architects of the future. Teaching is more than a profession - it is a lifelong mission. At the university level, where the youth of society prepare themselves for leadership in all affairs such as earning knowledge, creating innovations, building nations, etc. The role of teachers becomes even more dynamically critical and crucial. Universities are not merely centres of higher education and research; these are the places to inculcate cognitive content and a sense of patriotism, impart ethical, moral and cultural values, produce good human beings, ensure societal progress and development, etc. Thus, the selection criteria for appointing university teachers must be cautiously framed to ensure that only the most capable, committed, dedicated, research-oriented and ethically and morally superior individuals are entrusted with these noble responsibilities.

Academic Excellence

The primary criterion for selecting university teachers must have a strong academic background. In this regard, the University Grant Commission (UGC) formulated specific guidelines mentioning minimum academic requirements with CGPA/equivalent grade. Some universities developed their own academic pre-requisites and grades based on the UGS's guidelines. So, the academic results should be one of the main selection criteria for the post of university teachers. A candidate must possess not only relevant degrees but also evidence of consistent academic performance. It is mentioned in the Holy Quran, **"Say: Are those who know equal to those who do not know?"** (Surah Az-Zumar, 39:9). Unquestionably, this verse underscores the supreme value of knowledge. A university teacher should possess not only formal academic qualifications but also deep intellectual maturity. A track record of scholarly publications, research contributions, and engagement in the academic community should be brought under consideration. However, mere certificates are not enough - the depth of knowledge and the ability to translate complex cognitive content into comprehensible lessons should be taken into account.

Teaching Aptitude

Possessing knowledge and imparting that effectively are not the same. The Holy Quran reminds us, **"Invite to the way of your Lord with wisdom and good instruction…"** (Surah An-Nahl, 16:125). This verse highlights that effective teaching is rooted in wisdom and clarity. A good university teacher must demonstrate strong communication skills, a critical outlook, clarity of thought, and the ability to create curiosity in students. A candidate's academic results can be ascertained by the academic certificates and grades the candidate has already achieved, but the quality of communication deserves adequate consideration during recruitment. Candidates should undergo teaching demonstrations or assessments to evaluate their pedagogical and communication skills. Therefore, teaching demonstrations and interactive assessments should be part of the selection process. True, from teachers, students at the tertiary level essentially require proper guidance that goes beyond textbooks; therefore, the ability to mentor, motivate, and shape future professionals is crucial.

Technology and Digital Competence

To get oneself accustomed to technology is also essential for the appropriate functioning of modern-day higher education. Technological competence is no longer a choice, particularly in the management and guidance of

digital platforms for conducting classes and assisting students in research as well. The ability of teachers to be familiar with online learning, remote instruction, and educational technology is a prime requirement that reinforces educational advancement, and, thus, it should be given due importance. Moreover, a candidate having the skills to utilize technology fruitfully must be determined, because it will help universities remain ready to meet the challenges of blended and digital education.

Research and Innovation

Universities flourish on the generation of new knowledge. As the philosopher and essayist Francis Bacon wrote, *'Knowledge itself is power.'* Teachers should be chosen for their potential and efficiency to contribute to research, innovation, and also effective solutions to problems. Thus, the selection process should prioritize candidates who display an inclination toward research, innovation, and interdisciplinary knowledge and thinking. Teachers who can generate critical and comprehensive knowledge, publish articles in reputed journals, and contribute to solving real-world problems will be able to strengthen the university's standing and enrich the nation's intellectual capital. Participation in extra-curricular and co-curricular activities may also be taken into account for proper assessment. In the process of recruitment, adequate emphasis should be given to the publication and the number of citations of the candidate. Therefore, the main aspects of university teacher recruitment should revolve around issues such as the grade of academic qualifications and communication skills. But the policy should also encompass analytical power with critical thinking ability and the quality of research publication. The added qualities should be given due importance, such as having higher degrees (PhD and MPhil), publication in the impact factor journals, experience or involvement with a think-tank organization or in any intensive research work, technological know-how, etc. They should possess the ability to impart effectively by relating classroom teaching by giving some examples from the real world.

Moral and Ethical Standards

A teacher is not only an academic pedagogue but also a moral guide. The teachers' role extends beyond academics, including sharing knowledge and imparting moral values and ethics to students (Tabassum & Alam, 2024). Knowledge without ethics is dangerous. The Prophet Hazrat Muhammad (peace be upon him) said, **"The best among you are those who learn the Quran and teach it."** (Sahih al-Bukhari: 5027). This Hadith emphasizes that teaching is not only a sacred trust but also a most outstanding activity. University teachers must have to prove themselves as symbols of honesty, integrity, tolerance, morality and respect in diverse situations. Teachers' character must be moulded with all these traits, and these should be reflected by the individuals' habitual activities. Their behaviour and manners, both inside and outside the classroom, should set examples for students. People learn more by observing the activities of the preacher, not from mere listening to his words. In view of that, the lifestyle of teachers and behaviour should serve as a role model for students, reminding us of the Greek philosopher Aristotle's words, *"Educating the mind without educating the heart is no education at all."* Therefore, university authorities should develop a mechanism to evaluate the ethical disposition and performance of assigned responsibilities of newly recruited teachers during their probation period to ensure that they can nurture and transform students into responsible citizens. Authorities should also take steps to evaluate whether the dynamism of newly appointed teachers has so far been reflected in their art of teaching in classrooms.

Apolitical and Positive Mindset

In the context of many developing nations, including Bangladesh, university campuses are often influenced by respective political ideologies and activities. It is, therefore, essential that teachers remain apolitical, objective, and positive-minded. Their focus should be on nurturing knowledge and values, not fostering divisions and on differential ideology and philosophy. Teachers with a positive and apolitical mindset might help preserve academic sanctity and harmony on campuses. A university thrives best when its faculty members uphold neutrality and fairness. However, there are some issues where teachers and students both are expected to show not only concern but also recommend measures to move forward, such as on-going ethnic-cleansing in Gaza by Israel and elsewhere. A university needs a set of good human beings as teachers, not merely skilled personnel; they are rather the highly potential section of society. The final word is - teachers and students, as per their profession and duties, have nothing to do with politics, which is a completely different field that is supposed to exist very far from the field of education and research.

Balanced Evaluation Process

The selection process must be transparent, merit-based, and free from nepotism, favouritism, or political interference. Plato, in *The Republic,* argued "society flourishes when knowledge-bearers lead with wisdom and justice." Therefore, Independent academic panels, including an external panel of experts, should evaluate candidates through written examinations, class demonstrations to justify the art of teaching, interviews, and research presentations. This will ensure a fair and balanced evaluation that prioritizes quality over connections. If meritorious candidates are not appointed as teachers, the dormant talent of students will never thrive. It is apparent that moral and ethical aspects of the candidates cannot be appropriately ascertained during their recruitment; so, this important matter should be evaluated and confirmed when their probation period is over, by the competent, impartial assessment committee, formed by the authority.

University teachers hold the key to shaping enlightened citizens and building up a knowledge-based society. Therefore, the selection criteria must not be compromised under any circumstances. A blend of academic brilliance, teaching skills, research capacity, ethical strength, and social responsibility should be the foundation of the selection process. The Quran, Hadith, and timeless wisdom from world literature - all point to one truth: the nurturing of minds and illumining of souls is a sacred duty. If we aspire to achieve excellence in higher education and create a generation capable of leading the nation with intellectual wisdom, the careful and principled selection of university teachers is not just necessary - it is indispensable.

Note: This article was published in the 'Daily Sun' on 10 September 2025.

Bangladesh University of Professionals (BUP): Accreditation and Quality Education

Major General Mohammad Quamruzzaman (retd)
Adjunct Professor
Faculty of Business Studies

Introduction

Bangladesh University of Professionals (BUP) is one of the public universities among three international, 55 public and 116 private (total 174) universities in Bangladesh. BUP pursues quality in undergraduate, graduate and post-graduate programs since its establishment through the BUP Act 2009. The United Nations (UN) Sustainable Development Goal (SDG) 4 of the 17 SDGs commits to for inclusive and equitable quality education and promotes lifelong learning opportunities. Still in operation, the oldest Bologna University (1088) of Italy and the 2nd oldest Oxford University of the United Kingdom (UK) came to present standard after a thousand years. Mediaeval universities adopted *the liberal arts: quadrivium* (arithmetic, geometry, music and astronomy) and *trivium* (grammar, logic and rhetoric) to ensure quality. Traditional methods saw a new inclusion of outcome-based education (OBE) in universities. 'University' is derived from Latin *universitas magistrorum et scholarium,* the community of teachers and scholars. Earning knowledge is not for livelihoods only, but for spiritualism beyond materialism. Bangladesh is a signatory to the *Washington Accord*, one of the international accreditations for quality engineering education.

BUP, as a flagship among 7 military (3 public and 4 private) universities, moves with the Bangladesh Accreditation Council (BAC) fulfilling Article 17 of Bangladesh Constitution that entrusts the State to adopt effective measures for the purpose of establishing a universal education system to meet the needs of society: local, regional and global.

BAC Act 2017 and Accreditation

BAC is established through the BAC Act 2017 to accredit higher education institutes and academic programs. BUP's five faculties are: Arts and Social Science, Security and Strategic Studies, Science and Technology, Business Studies and Medical Studies. The three centres are: Research Centre, Centre for Modern Languages and Centre for Higher Studies and Research. Besides 8 faculties/centres, there are 57 affiliated Army, Navy, Air Force and Border Guard Bangladesh colleges and institutes for which BUP needs accreditation from BAC. BAC Act 2017 possesses 27 Sections. BAC was formed in 2019 by Section 4 of the Act. As per Section 5 of the Act, the location of BAC was at Mohakhali but was relocated to Minto Road, Dhaka. It is responsible for higher education institutions (HEIs) and academic program offering entities' accreditation for quality assurance, leading to international recognition. BAC Motto is: Sustainable Socioeconomic Development through Excellence in Higher Education. Four full-time members and eight part-time members under a chairman work in BAC following Section 6 of the Act.

Accreditation is the independent, third-party evaluation of a confirmatory and conformity assessment against recognized standards, conveying a formal demonstration of impartiality and competence. It is to carry out specific conformity tasks: inspection, testing and certification. Over-reliance on inputs of higher education accreditation, such as infrastructure facilities, qualifications of faculty members, instructional time, research activities, etc, to be weighed-out compared to students' learning outcomes. The American Council for Higher Education Accreditation maintains contact with accreditation bodies of 175 countries, including Bangladesh.

BUP's Quest for Quality in Higher Education

56-acre BUP campus is a super-fusion of land-water-light-air. Well-coordinated and connected systems at BUP emphasize local actions conforming to the global scenario. The *glocal* (*global+local)* work phenomena at BUP are unique. UN 17 SDGs by 2030 mention in Goal-4 about quality education besides inclusion and quantity. BUP's vision is to emerge as a leading university for professionals through need-based education and research with a glocal perspective. BUP's mission is to develop the civil and military human capital through advanced education and research to the respond to the knowledge-based society of the contemporary World.

'Professionals' possess a special definition in the BUP Act 2009 Section 2 (19). BUP's organic 8 faculties/centres and 57 affiliated colleges/institutes run about 94 programs in a *glocal* context and content. Public-Private dichotomy turned win-win at BUP through the Public-Private Partnership (PPP) Act 2015. Strong civil-military relations and cooperation in BUP's Senate, Syndicate and Academic Council bring synergies. 'Excellence through Knowledge' in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM), along with Humanities, Social Science, Business Administration and Strategic Management, ensures a knowledge economy for SDGs.

Historiography of Accreditation and Quality

Polymath Pythagoras used quality matrix *quadrivium* and *trivium* for Greek City State *Croton's* victory over *Sybaris* in 510 BC. Athenian military Captain Socrates (470-399 BC) coined *philosophy*: Greek *phil* (love); *sophia* (wisdom). Socrates' disciple Plato and Plato's disciple Aristotle provided philosophical solutions to universal problems in their accredited *Academy* and *Lyceum*. Alexander, a soldier-emperor learned epistemology, polemology and ontology from these universities.

Strategy from Greek *strategia* means the generalship/the art of handling troops. Hesiod's *Theogony*, Valmiki's *Ramayana*, Vyasa's *Mahabharata*, Homer's *Iliad/Odyssey*, Abrahamic Prophets' *Theology/Holy Wars* depict struggles/battles. These are primary sources of various *-logy, -ism, -gony, -ics, -graphy, -gogy, -sophy* and *-cracy*. These were taught in accredited/quality institutes by credential teachers like *Krisna, Drunacharya, Achilles, Ulysis, Sun-Tzu, Chanakya, Khalid, Tarique, Atish-Dipankar,* etc.

Misconception on University Rankings

Global QS Rankings by Wharton-MBAs *Nunzio Quacquarelli* and *Matt Symonds*, THE Rankings by *Times Higher Education* and ARWU by *Academic Ranking of World Universities* have no international-legacy/public-authority. UNESCO is officially entrusted to work on quality university education. It is questioned whether rankings do more harm than good. Profit-motives of ranking organizations create misperception/misconception among prospective university students, guardians and related stakeholders.

Rankings consider universities' wealth/endowments, admissions, foreign faculty/students, research, alumni-successes, teachers' credentials, etc. Comparison criteria vary from country to country, economy to economy and culture to culture. Quality-education at BUP is maintained against the pressure of quantity increase which may not be the case in Western universities. QS/THE/ARWU may not count BAC's endeavours for quality education. Thus, BUP should not worry about rankings by QS/THE/ARWU.

Conclusion

BUP's efforts for accreditation from BAC for its programs and institutes ensure quality higher education, as mentioned in the BAC Act 2017 and the follow-on Accreditation Rules 2022 conforming to the Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF). Higher education demands andragogy: *andra* (adult), *gogy* (teach) and heutagogy: *heuta* (self), besides pedagogy: *peda* (child), followed for *rote-memory*. BUP emphasizes *heuristics*: seeking solutions by self-discovering, inventing and innovating.

BUP has links with the Bangladesh Accreditation Board (BAB) established under the Bangladesh Accreditation Act 2006, for its testing laboratories to run around 94 higher education programs at 8 faculties/centres and 57 affiliated institutes. Through holistic *trivium* and *quadrivium*, glocal synergy is achieved at BUP, liaising with the Ministry of Education, University Grants Commission, BAC and BAB.

Historiography reveals that various *-logy, -ics, -graphy, -ism, -gony, -sophy* and *-cracy* have connections with *Theology* and *Polemology* studied at Plato's *Academy,* Aristotle's *Lyceum,* Vedic *Taxila,* Jewish *Elephantine,* Buddhist *Nalanda,* Fihri's *Al-Qarawiyyin,* Fatimid's *Al-Azhar,* Christian's *Bologna,* etc. BUP's *Theology-Polemology* relevance is an accreditation for BUP's quality education too.

Strengthening Universities Through Media: A Perspective

Air Commodore Ferdous Mannan
Chief of Public Relations, Information and Publications

Introduction

In today's global knowledge economy, universities are not only centres of education but also complex institutions that interact with society, industry, and government. Media, in both traditional and digital forms, play an instrumental role in this system by serving as a bridge between universities and their stakeholders. From communicating institutional values to promoting research, supporting recruitment, and fostering social change, the media has become a strategic tool for higher institutions offering higher education worldwide. This article explores the key functions of media in universities, with a particular focus on communication, research promotion, branding, recruitment, educational development, alumni relations, and crisis management.

Some Roles of Media in Universities

Being a vast and versatile arena, the media can play many roles in universities. A few important roles are narrated below:

a. **Communication and Stakeholder Engagement :** Media can facilitate effective communication between universities and their diverse stakeholders, including students, faculty, alumni, policymakers, and the wider community. Traditional outlets such as newsletters and press releases would remain relevant, but digital platforms, especially social media, may become the dominant channels for real-time engagement. Universities can use platforms like Facebook, Instagram, X (Twitter), and LinkedIn to share announcements, promote events, and engage in dialogue with stakeholders, thereby creating a sense of community and enhancing institutional transparency.

b. **Promoting Research and Academic Achievements :** Universities are hubs of knowledge production, and the media can play a crucial role in disseminating their research outputs. Press releases, academic blogs, and open-access repositories can help expand the visibility of research beyond scholarly circles. Media promotion of conferences, symposiums, and publications may also facilitate collaboration and enhance the institution's academic reputation. By showcasing research achievements, universities can strengthen their global standing and attract funding and top-tier talent.

c. **Branding and Reputation Management :** In a highly competitive higher education landscape, reputation is central to institutional success. Media can be instrumental in shaping university branding by highlighting academic excellence, notable alumni, innovative facilities, and social impact. Strategic public relations campaigns can ensure that achievements are projected positively, positioning the university as a leader in education and innovation. Strong branding through media may not only attract students and faculty but also foster partnerships with industry and government.

d. **Recruitment and Admissions :** The media has transformed the way universities recruit students. Online campaigns, virtual campus tours, testimonial videos, and interactive websites provide prospective students with immersive insights into university life. Digital platforms can influence student decision-making more than traditional brochures or advertisements. Targeted social media ads and search engine optimization (SEO) can also allow universities to reach international audiences, thereby expanding their applicant pools and fostering diversity.

e. **Educational Development :** Media can also enhance teaching and learning by providing access to educational resources beyond the classroom. Online courses, video lectures, and podcasts can support blended and distance learning models that are increasingly popular in higher education. Platforms like YouTube and institutional repositories can allow faculty to share lectures globally, promoting lifelong learning and interdisciplinary collaboration. Additionally, digital media can enable students and faculty to form virtual communities for knowledge exchange, expanding the learning ecosystem.

f. **Alumni Relations and Networking :** Sustaining strong alumni networks is vital for institutional growth. Media can keep alumni connected to their alma mater through newsletters, online events, and social media groups. Success stories of alumni, highlighted through media campaigns, can not only inspire current students but also encourage alumni to contribute financially or through mentorship. Thus, media can serve as a tool for strengthening loyalty and long-term institutional support.

g. **Crisis Management and Transparency :** During crises, such as pandemics, political unrest, or campus controversies, the media can ensure transparent and timely communication. Quick dissemination of information through press releases, websites, and social media updates can help maintain trust, manage misinformation, and reassure stakeholders. Effective media strategies during crises can strengthen institutional resilience and safeguard reputation.

The Case of Bangladesh

For universities in Bangladesh, where competition among public and private institutions is intensifying, adopting a strategic approach to media is crucial. Universities may:

a. Develop comprehensive media strategies aligned with institutional goals.
b. Strengthen digital presence through bilingual communication (Bangla and English).
c. Promote research outputs via open-access platforms.
d. Use targeted digital campaigns for admissions and outreach.
e. Invest in e-learning platforms to expand access.
f. Build alumni and industry relations through dedicated digital portals.

By integrating these strategies, Bangladeshi universities can enhance their visibility, attract global talent, and strengthen their contribution to national development.

Conclusion

Media has become a cornerstone of modern higher education, shaping how universities communicate, teach, recruit, and engage with society. It can amplify research achievements, build institutional reputation, strengthen alumni relations, and ensure transparency during a crisis. For universities in Bangladesh and beyond, adopting a comprehensive media strategy is no longer optional. It is vital for academic excellence, social relevance, and global competitiveness. By harnessing the full potential of media, universities can reinforce their role as engines of knowledge, innovation, and societal transformation.

References :

- Junco, R., Heiberger, G., & Loken, E. (2011). The effect of Twitter on college student engagement and grades. *Journal of Computer Assisted Learning*, 27(2), 119–132. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2010.00387.x
- Marginson, S. (2006). Dynamics of national and global competition in higher education. *Higher Education*, 52(1), 1–39. https://doi.org/10.1007/s10734-004-7649-x
- Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M., & Jones, K. (2013). *The effectiveness of online and blended learning: A meta-analysis of the empirical literature*. Teachers College Record, 115(3), 1–47.
- Peters, H. P., et al. (2008). Science communication: Interactions with the mass media. *Science*, 321(5886), 204–205. https://doi.org/10.1126/science.1157780
- Weerts, D. J., & Ronca, J. M. (2008). Characteristics of alumni donors who volunteer at their alma mater. *Research in Higher Education*, 49(3), 274–292. https://doi.org/10.1007/s11162-007-9077-0

Student Responsibilities from the Beginning of University Life: Building Foundations for National and Global Contribution

Tahmina Sultana
Assistant Professor
Department of Business Administration in Management Studies

University life is often considered the turning point in a student's personal and professional development. It is a period of transition in which young individuals enter a more independent world, equipped with greater freedom but also faced with deeper responsibilities. The habits and choices students cultivate from the very first day at the university determine not only their own future but also the progress of their families, communities, and even their nation. In a globalized world, where opportunities are interlinked across borders, the responsibility of university students extends beyond their homes and country, encompassing a duty to contribute meaningfully to the broader international society as well. Therefore, it is essential to reflect on what students should do from the very beginning of their university life so that they can grow into responsible citizens, effective professionals, and ethical global participants.

1. Understanding the Purpose of University Education

At the very outset, students must realize that university education is not just about obtaining a degree or securing a job. It is about holistic growth, intellectual enrichment, and character building. Students should enter with a mindset that they are preparing themselves to face real-world challenges with knowledge, skills, and wisdom. This perspective motivates them to take their studies seriously, attend lectures attentively, and engage with learning materials in depth. When students value education as a long-term investment, they are more likely to remain committed and purposeful throughout their journey.

2. Developing Discipline and Time Management

One of the first responsibilities of a university student is to cultivate discipline in daily life. Unlike school, where teachers and parents constantly monitor progress, university students must take ownership of their time and schedule. Effective time management ensures that academic tasks, personal commitments, and extracurricular activities are balanced. Students who learn to set priorities, avoid procrastination, and meet deadlines build a reputation for reliability. These qualities not only help them succeed in academics but also prepare them for professional excellence, where discipline and punctuality are valued globally.

3. Building Strong Academic Foundations

Academic success remains the cornerstone of university life. From the beginning, students should attend classes regularly, complete assignments on time, and make use of library resources. Beyond classroom learning, students should develop habits of independent study, research, and critical thinking. In today's competitive world, surface-level knowledge is insufficient. Instead, deep understanding, analytical ability, and problem-solving skills distinguish outstanding graduates. These qualities help students contribute to their nation by becoming innovators, skilled professionals, and policy shapers who can address societal challenges.

4. Engaging in Extracurricular Activities

A well-rounded student is one who engages in activities beyond textbooks. University life offers diverse opportunities such as debating clubs, cultural organizations, sports teams, volunteer groups, and leadership societies. From the first year, students should actively participate in such initiatives to build confidence, communication skills, teamwork, and leadership abilities. These experiences enable them to contribute to

society by becoming socially responsible individuals who can mobilize communities, influence peers positively, and manage collective efforts. On a global scale, such skills are transferable to international organizations, multicultural workplaces, and global civic engagements.

5. Nurturing Ethical and Social Responsibility

Students must remember that higher education is a privilege not enjoyed by everyone in society. Therefore, it is their moral responsibility to use this privilege for the betterment of others. From the start of university, students should engage in community service, support underprivileged groups, and raise awareness about social issues. Even small acts, such as participating in blood donation drives, tutoring disadvantaged children, or campaigning for environmental sustainability, reflect responsible citizenship. When practiced consistently, these actions prepare students to become contributors not only at home but also at the global level, where ethical responsibility and sustainability are valued.

6. Using Technology Wisely

In the current era, social media and digital tools dominate student life. While these platforms provide immense learning opportunities, they also carry risks such as distraction, misinformation, and addiction. From the beginning of university, students should learn to use technology productively—engaging in online learning, accessing digital libraries, attending webinars, and networking with professionals. They should avoid falling into the traps of fake news, excessive entertainment, or unproductive scrolling. The wise use of technology enhances knowledge, broadens horizons, and allows students to remain globally connected and competitive.

7. Fostering Global Awareness and Competence

University students must prepare themselves to thrive in an interconnected world. This requires awareness of global issues such as climate change, migration, technological innovation, and international conflicts. Students should cultivate intercultural competence by reading about different cultures, engaging in exchange programs, or participating in cross-cultural dialogues. Proficiency in international languages, especially English, further expands opportunities abroad. By doing so, students can represent their country positively on global platforms and also bring back knowledge and innovations to strengthen their homeland.

8. Cultivating Research and Innovation Mindset

From their early days at university, students should be encouraged to engage in research, innovation, and problem-solving. Universities are not only centres of teaching but also of discovery and creativity. Students who involve themselves in research projects, fieldwork, and scientific inquiry develop an attitude of curiosity and innovation. This mindset enables them to contribute solutions to pressing national challenges such as poverty, health issues, or infrastructural gaps. At the same time, through collaborative research with international scholars, they can contribute to global knowledge and innovation.

9. Balancing Individual Ambition with Collective Responsibility

It is natural for students to dream of personal success, whether through securing high-paying jobs or prestigious scholarships abroad. However, they must remember that their growth should align with collective responsibility. From the beginning, students should develop a sense of gratitude toward their families, institutions, and nation that have supported their education. This gratitude should translate into a willingness to give back—whether through mentorship, knowledge sharing, or service. Students who balance personal ambition with collective responsibility shine not only as professionals but also as nation builders.

10. Developing Emotional Intelligence and Resilience

University life is often challenging, filled with academic pressure, competition, and personal struggles. Students who learn to manage emotions, deal with failures, and support peers emerge as emotionally intelligent individuals. Such resilience helps them adapt to difficulties, remain optimistic, and motivate others. Emotional intelligence is a vital skill for leadership at home, in workplaces, and on international platforms. From the first day of university, students should work on empathy, patience, and the ability to handle stress effectively.

11. Networking and Alumni Engagement

Another vital responsibility is to begin networking early. Students should build connections with peers, faculty members, and alumni. Alumni, in particular, serve as valuable sources of mentorship, career guidance, and professional opportunities. By maintaining respectful and meaningful relationships with alumni, students ensure that their academic journey is enriched with practical insights and long-term career benefits. This networking not only enhances individual opportunities but also strengthens the overall reputation of the university and the nation.

12. Becoming Agents of Positive Change

Ultimately, the responsibility of a university student is to see themselves as agents of positive change. From the first day, students should embrace values such as integrity, accountability, respect, and perseverance. Every small effort, whether excelling in academics, helping a peer, joining a social cause, or publishing a research paper—contributes to building a brighter future for their country and for humanity. University students are, in fact, the bridge between present realities and future possibilities. Their actions, decisions, and values have a multiplier effect on families, communities, and nations.

Conclusion

The beginning of university life is a golden opportunity to lay a strong foundation for personal growth and societal contribution. By focusing on discipline, academic excellence, ethical responsibility, technological literacy, global awareness, innovation, and social engagement, students can shine in their respective fields and contribute both at home and abroad. A responsible student is not merely concerned with securing a degree but is committed to becoming a source of inspiration, progress, and harmony. In an age where knowledge, technology, and cultures cross borders, the responsibility of university students extends to shaping a better world. Therefore, every student should treat university life not as a passive phase of learning but as an active journey of self-development and service to humanity.

Marketing for Socialization: the Art of Being a Good Friend

Ashik Abdullah
Assistant Professor
Department of Business Administration in Marketing

When you hear the word *marketing*, you might picture flashy ads, annoying pop-ups or an unwanted salesperson. But what if I told you that marketing is more like being a good friend? You might think of marketing as something manipulative, exaggerating facts just to get attention. And yes, sometimes it's used that way. However, just like any powerful skill, you can use marketing to mislead, or you can use it to genuinely care about others. At its core, marketing is about how you understand people, how you engage with them, and how you add value to their lives. In fact, whether you realize it or not, you already practice marketing every day when you market ideas, when you talk to others. You market emotions when you comfort a friend. When you introduce yourself at a party, you're marketing your personality. Marketing isn't just a business function; it's a life skill. Perhaps one of the most important social skills! One that helps you become the kind of person others feel comfortable opening up to.

Before you respond, define the purpose

In marketing, *Listen → Understand → Speak* is one of the most powerful and surprisingly simple frameworks. Many of us assume that communication starts with speaking, but seasoned marketers know it begins with listening. They pay close attention, absorbing not only the words but also the tone, emotion, and context. Only after they truly understand what's being communicated do they respond with intention and clarity.

This principle applies beautifully to everyday conversations. Effective communication isn't just about exchanging words; it's about uncovering meaning. Picture this: a friend says, *'I'm fine,'* but their voice cracks, their shoulders slump, and their smile doesn't reach their eyes. Most people hear the words. Good communicators hear the story behind them.

Equally important is defining why you're responding. Are you offering comfort, proposing a solution, or simply being present? Just as every marketing campaign needs a clear goal, every meaningful conversation benefits from clarity of intent. Without it, we risk misunderstanding the other person or even unintentionally causing harm.

Before you speak, take a brief pause and ask yourself: *What is the purpose of my response?* That small moment of reflection can completely transform how you communicate with others. Instead of reacting impulsively, you respond with empathy and relevance.

In both marketing and life, purposeful communication builds credibility, deepens relationships, and creates space for real understanding. So, the next time you're about to speak, listen first, understand fully, and then speak with purpose.

Less is More: Sometimes, the Minor the Input, the Greater the Impact

Knowing your audience is the prerequisite for setting any marketing strategy. But it isn't only about age or background, it's about understanding people's intent, emotions, needs, and preferences. The same idea applies

to everyday conversations. When someone is speaking to you, try to pay attention to their non-verbal cues. Are they looking for validation, empathy, honest feedback or simply your quiet presence?
Let them guide the conversation. Often, people don't want advice or opinions; they just want to feel heard. You don't always need to fill the silence or jump in with solutions. Sometimes the most meaningful thing you can do is simply hold space and hear.

Marketing also teaches us the value of a 'pull' approach over a 'push' approach. Instead of pushing your ideas, opinions, or judgments onto others, allow people to pull what they need from your presence. It's a small shift, but it builds a stronger sense of trust and connection.

That also means knowing when not to speak. Just because you can say something doesn't always mean you should. Choosing to hold back a reactive or emotionally charged comment can protect the tone of a conversation and sometimes even a relationship.

For example, imagine you're at a party and a friend starts retelling a story you've already heard, and you know it's slightly exaggerated. Rather than interrupting with 'You always stretch the truth,' you simply smile and let them have their moment. That small act of restraint keeps the mood light and the friendship intact.

Misunderstanding is the pillar of better understanding
Even with the best intentions, you will sometimes get things wrong, and that's often where real learning begins. Honestly, there are moments you speak when you should have listened, offer advice that wasn't needed, or react emotionally when silence would have been wiser. And that's okay. Every misstep is a chance to grow. In fact, some of the most meaningful lessons come from the conversations you wish you had handled differently.

Let your 'audience' become your teacher. The friend who shared something personal and left feeling hurt, maybe you misread what they really needed. The junior who stays quiet around you may feel that your presence is intimidating. Pay attention to the small cues, and be willing to ask yourself: *What could I have done differently?* Growth doesn't come from getting everything right; it comes from reflecting when you don't. And when you bring that mindset into your relationships, you don't just become a better communicator, you become a better human being.

The Real ROI: Trust fundamentally, marketing isn't about transactions; it's about credibility. The best brands don't just sell, they solve problems, the way good friends listen and try to understand. Next time you hear the word 'marketing,' think of relationships, values, and genuine rapport. In a noisy world, people who truly understand others are rare and valuable. You're not just building networks; you're rearing reputation, faith, and legacy. Because Friendship isn't defined by what you share, but by how much you care.

Stronger Together: Ending Ragging through Awareness and Action

Niamat Ullah
Legal Officer
Legal Cell, Registrar's Office

Ragging is one of those words that immediately brings to mind fear, anxiety, and painful memories. While a few may try to brush it off as 'just tradition', harmless fun', or a 'long-practiced legacy to get connected with seniors'. The reality is that none of these practices result in positive interactions between either party. Ragging, while itself carrying a negative connotation, often crosses the line from what is viewed as 'ice breaking' to harassment, humiliation, or even violence. At its heart, it violates a student's dignity and sense of safety, and it has no place in a learning environment.

In Bangladesh, no uniform anti-ragging law is currently in effect. That does not mean students are without protection. Several provisions of the Penal Code covering assault, criminal intimidation, wrongful restraint, and defamation can be applied to punish ragging in major cases. Over the years, courts have also directed academic institutions to take preventive measures. The government has addressed this issue in the *Guidelines Related to Anti-Ragging at Educational Institutions 2023,* published by the Ministry of Education, which formally defines ragging and encourages institutions to take firm action. The High Court directed all colleges and universities in Bangladesh to establish anti-ragging committees to prevent such activities and ensure the effective implementation of the anti-ragging guidelines.

At Bangladesh University of Professionals (BUP), the commitment is to maintain a safe, disciplined, and respectful campus in all circumstances. *The BUP Students Code of Conduct and Disciplinary Rules 2024* go further than most institutional frameworks. They have already established a *Permanent Committee on Anti-Ragging and Bullying*, which continues to carry out a wide range of activities, including identifying and evaluating actions that fall within the definition of ragging, outlining how to report it, and setting clear penalties for those involved. This clarity is vital because vague promises are never enough. When expectations and consequences are explicit, students, teachers, officers, and staff all know exactly where they stand. It deters potential offenders and helps survivors and witnesses feel confident to speak up.

What Constitutes Ragging

Ragging can be verbal, written, physical, social, cyber, sexual, or psychological, involving acts committed by senior students against junior students that demean, intimidate, coerce, or abuse, often under the guise of tradition, initiation, or bonding. The *Guidelines Related to Anti-Ragging at Educational Institutions 2023* define ragging to include behaviour that causes fear, humiliation, harassment, physical injury, psychological harm, or mental distress, whether committed individually or collectively.

Responding to Ragging

- Understand the definition: If someone's actions make you feel unsafe, humiliated, or coerced, it may qualify as ragging.
- Speak up: Report incidents immediately to the concerned Department, the Proctor's office, or the Anti-ragging and Bullying Committee.

- Document evidence: When safe, note down details such as time, location, names, digital evidence, and witnesses.
- Support peers: If you see someone being targeted, support them. A small gesture can mean a lot.

Moving Forward at the National Level:
While BUP has strong safeguards, Bangladesh would benefit from a unified national anti-ragging law to ensure consistent standards across all educational institutions. Such a law could mandate:

- A 24/7 national anti-ragging helpline
- Mandatory rights awareness during student orientation
- A standardised complaint process across campuses
- Stronger mental health and counselling support for survivors

A Shared Responsibility:
Creating a safe campus is everyone's job. It's not enough to simply avoid ragging. We must challenge it whenever we see it, stand by those affected, and work towards policies that make it impossible for such behaviour to survive. University life should be about growth, friendship, and opportunity, not fear. When students stand together, they send a clear message: dignity, respect, and safety are non-negotiable. Let's make sure that's the culture we hand down to every new generation.

Are We Good Citizens? A Simple Test

Meherin Ahmed Roza
Lecturer
Department of Public Administration

'Reform' – a buzzword we often use nowadays. What is reform? It simply means '*bringing changes into something in order to improve it*'. So naturally, whenever we utter the word 'reform', we start by 'criticizing' the existing setting – be it any institution or any system. It is perhaps in human nature that we mostly see faults in others except ourselves, and while criticizing, we become extra critical and leave no fault unmentioned. We see problems in almost everything, and when it comes to the country, most of us feel delighted to state how hopeless we are in this country and the countrymen!

But have you ever wondered, 'who are the countrymen?', and 'what the country even is without its people?'

Isn't it obvious that we are part of the very countrymen that we are discussing? Isn't it obvious that all the countries of the world are nothing but land territories except for their citizens, which and only which define their status? Without its citizens, a nation is just a territory on a map. So before making impulsive comments like 'Bangladesh is good for nothing,' we should ask ourselves, 'Why isn't my country better–what role have I played in holding it back, and what role can I play in changing it?'

The country, the government, and the public administration are all alive in our everyday lives. Therefore, proper public administration happens when both the leader and citizens play their parts responsively. It happens when we stop at the traffic light, when we turn the gas off, and when we pay the taxes. Now, let me ask you a few simple questions:

- Do you wait in line patiently, or try to cut ahead?
- Do you throw waste into the dustbin, or onto the street?

Your answers to these questions might reveal more about your role as a citizen than you realize. If you answered 'yes' to the first option in each case, congratulations–you are already practicing good governance in your daily life. If you answered 'no,' don't worry. This is not a test you fail once and for all. It's a test you can re-take and improve every single day. Because in the end, public administration is not only about what government officials do. It is also about how ordinary people–like you and me–behave in our daily lives.

For example, when a teacher comes to class on time, students respect discipline. Similarly, when a student studies sincerely, the teacher feels motivated. Together, they create an environment of learning–it is like a shared responsibility. The same logic applies to society at large. If officials are honest but citizens ignore the rules, the system collapses. If citizens are sincere but officials are corrupt, people lose trust. But when we both try together, something magical happens–we see cleaner cities, smoother services, and a brighter, more hopeful future.

Many people underestimate the power of small acts. They say, "What difference will it make if I alone follow the rules? Everyone else is breaking them anyway." But let me share a thought: every big change in history started with individuals who refused to ignore small actions. Social movements, reforms, and even revolutions have often been sparked by simple acts of responsibility.

When Rosa Parks refused to give up her bus seat in 1955, it was a single, quiet act of defiance. Yet, it became the spark that ignited the American Civil Rights Movement (Theoharis, 2013).

Good citizenship works the same way. One person following the rules encourages ten others. Ten inspire a hundred. And soon, society itself begins to transform–and thus the ever-wondering 'reform' actually happens.

***Picture**: Rosa Parks, the catalyst of the civil rights movement, refused to give up her seat on a Montgomery bus*

Reference:

Theoharis, J. (2013). The rebellious life of Mrs. Rosa Parks. Beacon Press.

Blockchain Technology in Public Administration: Prospects and Challenges

Anas Al Masud
Lecturer
Department of Public Administration

Introduction

Blockchain technology is one of the foundational pillars of the Fourth Industrial Revolution (4IR), representing a paradigm shift in database management. While its core components, like cryptography, proof-of-work, and chained timestamps had been invented over time, Satoshi Nakamoto successfully combined them into a revolutionary system-the blockchain. At its core, this technology is a cryptographically secure database maintained by a user network of users. In this system, new information is added as sealed 'blocks' to the database, linking to a 'chain' of previously added blocks, creating a permanent, unbreakable chain of records. Each block comes with a unique cryptographic ID (hash). This system ensures that entering information becomes virtually immutable, as altering the data in any block would produce a different hash. However, the power of blockchain technology lies in its decentralized nature. Instead of being a central authority, this system relies on a collective agreement to validate new entries, fostering transparency and security. Hereafter, blockchain technology emerged as a package of transparency, accountability, efficiency, and trust. Although people often identify blockchain technology with cryptocurrencies only, its methodology of bypassing intermediaries is paving the way for decentralized governance and public involvement. Here after, blockchain technology has become a buzzing concept in the field of public services and administration.

Blockchain Technology and Public Services: Prospects & Opportunities

Blockchain-based technologies are being built at a larger scale in both the government and public services around the world. These technologies are accelerating government functions mostly-verification, transaction security, land registry, and keeping public records safe. Hereafter, enhancing the government efficiency and transparency by cutting time, visits and costs. Hereafter, Public organizations in governments around the USA and Canada have started adopting blockchain technology-based solutions within their respective systems. From the real-world usages of blockchain in the government and public sector, a series of opportunities for growth can be tracked. The following are a few blockchain use cases in government.

- **Blockchain-Based Voting Systems:** Applications of Blockchain in Government can also manage the e-voting machines by keeping track of information on the blockchain. With encryption and a decentralized nature, the distributed ledger becomes unbreakable, leaving no scope for network disruption. This secured network can prevent election fraud and complete vote counting in a matter of seconds without any margin for errors.
- **Land and Property Registries:** Applications of blockchain in government include managing and administering the land registries, offering everyone an exact, shared ledger of the ledger offering all parties- ensuring transparency. Therefore, blockchain may simplify the land registry office by eliminating multiple layers of costly verification and providing greater flexibility indeed.
- **Public Safety and Law Enforcement**: Blockchain records are immutable, and therefore, criminals can be identified easily even if they are trying to create false identities. They also allow secure information sharing. In addition, if someone tries to gain access to economic data, the blockchain will detect the fraudulent act and alert the concerned authorities immediately. This technology may produce secure, decentralized migration records to help the border authorities verify illegal immigration as well.

- **Public Health Management**: Applications of blockchain in government can promote a secure, interoperable health information management system. Storing medical histories and patient records on blockchain can ensure security, integrity and consent management. It can also facilitate effective healthcare coordination, improving research capabilities and outcomes.

Blockchain Technologies and Prospects for Bangladesh

Beyond the mentioned few core advantages and benefits of blockchain technology, Bangladesh, if it sets its motive towards adaptation, may enjoy additional benefits as well. A few of those are mentioned as follows-

- **Decentralized Governance**: Blockchain enables decentralized decision-making and public participation, who is Bangladesh lacks to date. Blockchain will surely allow its citizens to be more involved in the government process and encourage an inclusive democracy.
- **Cost Reduction**: Service automation and service process simplification through the adaptation of Blockchain-based solutions will reduce the operational costs of government services.
- **Data Security**: its cryptographic methods and distributed ledger technology can provide secure storage of data and transactions, securing sensitive public information and data.
- **Public Trust:** its decentralized nature can help rebuild public trust in government institutions in Bangladesh, especially in offices burdened with corruption or inefficiency.

Precautions, Preparations and Future Directions

Despite the clear advantages of blockchain technology, the core area of challenges with blockchain technologies could be stratified into 3 categories.

1. **Technical**: Research works have indicated that the blockchain technology is still left to mature, as the vast majority of its proposed solutions are in a conceptual/experimental phase. Therefore, blockchain technology comes with both chances of benefits as well as potential failures. So, the policymakers need to act accordingly.
2. **Legal:** Research endeavours are expected to investigate frameworks to govern blockchain usage in the public sector, ensuring compliance with data privacy laws and addressing liability concerns.
3. **Social**: Organizational and societal implications of blockchain's decentralized and transparent nature must be studied to explore how it may reshape the relationship between citizens and their governments. Strategies must be investigated, building public trust in blockchain-based public services which is essential for widespread adoption indeed.

Conclusion

Blockchain is completely revolutionizing the era of public administration and services management, which solves one of the great concerns of the digital society-data security, indeed. The nature and process have all the potential of opening the door to revolutionizing public relations with the Administration. However, the incorporation of technologies is a complicated and slow process. Most relevantly, blockchain technologies need to cope up with the stances of technological immaturity, legal uncertainty and lack of public awareness, mediating which future research works are expected. Only if the challenges are mediated, undoubtedly, the blockchain has the potential to transform the genre of public interactions, improving cumulative societal wellbeing indeed.

Bibliography:

Bitcoin.com. (2020, October 2). How public administration can benefit from blockchain technology. Bitcoin News. Retrieved August 16, 2025, from https://usebitcoins.info/index.php/news/7642-how-public-administration-can-benefit-from-blockchain-technology

Mergel, I., Kattel, R., & Lember, V. (2024). The role of public value in leveraging digital technologies in public administrations. *International Journal of Public Sector Management*, 37(3), 321–339. https://doi.org/10.1108/IJPSM-12-2023-0361

Piccardo, G., Conti, L., & Martino, A. (2024). Blockchain technology and its potential to benefit public services provision: A short survey. *Future Internet*, 16(8), 290. https://doi.org/10.3390/fi16080290

Wang, J., Wang, Z., Li, J., & Yang, X. (2024). A blockchain-based dual-side privacy-preserving multiparty computation scheme for cross-organization collaborative computing. *Future Internet*, 16(8), 290. https://doi.org/10.3390/fi16080290

Wi-Fi in the Haor

Rifa Tasnia
Lecturer
Department of English

Rina Akhter, a fourteen-year-old girl, had always been clever, even before the signal towers reached the wetlands. She lived with her family in Tahirpur, Sunamganj District, in a stilted bamboo house in the Tanguar Haor basin–an endless stretch of sky and water where the horizon blurred, and boats were more common than roads. From her window, she often watched fishermen casting their nets at dawn, the rippling water turning gold, and migratory birds tracing arcs across the sky.

Most days, Rina helped her mother untangle fishing nets or shepherded their noisy ducks to the shallows. She washed clothes in the water and carried pitchers, balanced carefully on her head, from the tube-well. But in the evenings, when the wind cooled, the crickets and frogs began their chorus, and the lanterns of distant boats flickered like fireflies, she sat by the hurricane lamp reading borrowed schoolbooks. Her father, a fisherman with little schooling himself, always told her, 'Education is your oar, Rina. With it, you can row far.'

Then, everything changed.
One humid afternoon, a local NGO brought a mobile learning van to her village–a flat-bottomed solar-powered boat painted bright blue, its side panels opening to reveal shelves of laptops and tablets. Most children crowded around the glowing screens in awe. Rina, shy but curious, stepped forward. A volunteer held out a tablet. 'This is Wi-Fi,' he said, 'the internet. Want to try it?'

Her fingers trembled as she tapped the glass. The screen lit up with colours and voices. Within minutes, she was in a world larger than her haor. She watched a video explaining the solar system, then stumbled upon a children's English song. She repeated the words softly, testing their rhythm on her tongue.

From that day, she rowed across the wetlands whenever the boat docked, chasing the internet as if it were a floating treasure. She learned English phrases from YouTube, practiced algebra on free apps, and followed online lessons through her neighbour's smartphone late into the night. Her progress was so quick that the NGO, impressed, gifted her a refurbished tablet with five gigabytes of monthly data. It became her most precious possession–wrapped in cloth when not in use, protected from damp air and curious siblings.

Two years later, at sixteen, Rina sat for her SSC exams and passed with the highest marks in the union. The village celebrated, and neighbours came by with sweets. But the joy was shadowed by reality: college in town was expensive, and the bus ride itself meant a long boat journey before land travel even began. Her father's fishing barely kept food on the table.

So, Rina made a decision. If the world had come to her through Wi-Fi, she would send herself back into it the same way. She signed up on an international tutoring platform with the help of the NGO volunteer.

Her first student was a shy, second-generation Bangladeshi boy in New Jersey who wanted to speak Bangla with his grandmother. Rina taught him simple greetings and nursery rhymes she herself had learned as a child. Her second student was a curious girl in Nairobi struggling with fractions. Slowly, Rina's list grew: a teenager

in Canada preparing for exams, a boy in Malaysia fascinated by Tagore's poetry. By the end of the month, she had six students across three continents.

Every morning, Rina set up her small 'classroom' on the veranda of her stilted house. Wearing her blue salwar kameez, shawl neatly tucked, she balanced her tablet on a stack of books, put in her earbuds, and spoke with confidence. Sometimes she explained the difference between 'there,' 'their,' and 'they're.' Sometimes she drew neat diagrams of triangles on paper, holding them up to the screen. And sometimes, with a smile, she recited Tagore's verses, letting her students hear the lilt of her native tongue.

The haor did not make things easy. In monsoon storms, the Wi-Fi flickered, and calls dropped mid-sentence. Once, on her way to recharge the tablet at the learning boat, her small dinghy tipped, soaking her books–though she saved the device by clutching it high above her head. Still, she never gave up.

When people asked how a girl from a watery village with no paved roads could be teaching children in faraway cities, Rina only smiled. 'The signal came floating in,' she said. 'I just paddled toward it.'

And so the haor, vast and shimmering, carried not only fish, birds, and floodwater–but also knowledge, hope, and the echo of Rina's voice, rippling across continents through invisible waves.

Walking Through Mughal Memories: A Family Journey to India

S M Nazmus Sakib
Lecturer
Department of Development Studies

Travel has the power to connect us not only with places but also with history, heritage, and people. In December 2023, I undertook a journey to India with my father and mother from the 7th to the 12th. This was my first trip abroad after joining the Bangladesh University of Professionals (BUP) as a Lecturer, and I wanted to spend it in a way that reflected both personal curiosity and cultural roots. My long-cherished dream had been to experience the grandeur of the Mughal Empire, an empire that shaped much of South Asia, including Bengal. Our travels took us through Delhi, Agra, and Jaipur, cities rich in heritage. The trip became even more memorable when we were unexpectedly joined in Delhi by my uncle, aunt, and cousin, who shared their time with us and added joy to our exploration.

Delhi: Echoes of the Mughals

After reaching the airport, Delhi greeted us with a blend of modernity and antiquity. Among our first visits was the India Gate, a solemn yet grand war memorial. From there, we stepped into the vibrant world of Old Delhi, where the 17th-century Jama Masjid still stands as one of the largest mosques in South Asia. Standing within its vast courtyard, I felt a sense of connection to our own history in Bangladesh, where Mughal architecture left a similar legacy.

Old Delhi also delighted us with its food. The lanes surrounding Jama Masjid offered irresistible aromas of smoky kebabs grilled on open flames, syrupy jalebis stacked in sweet shops, and biryanis rich with saffron. As a lover of both kebabs and sweets, I found this part of Delhi unforgettable. Yet we balanced these vibrant street foods with fine dining in the evenings, where modern restaurants presented Mughal dishes with refined elegance.

Delhi also introduced us to pre-Mughal history at the Qutub Minar, a soaring tower built in the 12th century. Its intricate stone carvings reminded me that Delhi has been a capital for many dynasties, each leaving its layer upon the city.

Agra: At the Heart of Mughal Grandeur

If Delhi offered the first taste of Mughal heritage, Agra was the full feast. No matter how many times one sees its pictures, nothing compares to standing before the Taj Mahal. As we approached through its grand gateway, the white marble mausoleum revealed itself slowly, framed perfectly as Shah Jahan once intended. Built in memory of his beloved Mumtaz, the Taj Mahal is not just architecture; it is poetry in stone.

For me, visiting the Taj was not simply about seeing one of the "seven wonders." It was about fulfilling a personal longing to witness Mughal royalty firsthand. Bangladesh, too, was once a vital province of the empire; our mosques, forts, and gardens echo the same aesthetics. Standing at the Taj Mahal, I felt like I had walked into a shared chapter of South Asian history, where love, power, and art came together in a form so enduring.

Agra offered more. The Agra Fort, with its massive red sandstone walls, carried echoes of emperors walking its palaces and halls. From its balconies, Shah Jahan is said to have gazed at the Taj in his final days, imprisoned

by his own son. Fatehpur Sikri, not far from Agra, was another marvel. Once the Mughal capital under Akbar, its deserted palaces and courtyards whispered tales of ambition, spirituality, and eventual abandonment. Walking through them, I imagined the empire at its peak, a place where decisions once shaped millions of lives, including those in Bengal.

Jaipur: Rajput Elegance and Scenic Beauty

Our final stop, Jaipur, offered a striking contrast. Known as the Pink City, it carries a Rajput identity distinct from Mughal centers. The Hawa Mahal, with its honeycomb facade, seemed to float in delicate beauty, while the Jal Mahal, set in the middle of a lake, offered picture-perfect scenery. The most imposing was the Amber Fort, perched high above the city, its mirrored palaces and courtyards reflecting the grandeur of Rajput rulers. Jaipur also gave us a chance to enjoy the vibrant markets, where traditional textiles, handicrafts, and jewelry tempted visitors. A few small purchases made the memories tangible, linking us to the local artistry that continues to thrive.

The Flavors of the Journey

One of the most enjoyable aspects of the trip was the variety of food. While Delhi's Street food charmed us with its raw energy, and fine dining gave us polished Mughal flavors, the long drives between cities introduced us to another experience, the Indian Dhaba. These roadside eateries, simple in appearance but rich in taste, offered hearty meals of rotis, lentils, curries, and grilled items. Stopping at these places gave us a taste of everyday India, contrasting beautifully with the grandeur of the monuments.

Reflections

As our trip ended, I felt fulfilled. My long-held craving to explore the Mughal world had been realized. Walking through Delhi, Agra, and Jaipur allowed me to see the empire's splendor firsthand and to recognize how closely it connects with the heritage of Bangladesh. Our forts, mosques, and palaces are part of this shared story, making the journey not just international travel but a rediscovery of our own cultural roots.

The journey was enriched not only by the monuments but also by the moments, sharing meals with family, laughing during shopping sprees, pausing at dhabas along highways, and marveling at history together. Travel became both personal and historical: a way of bonding with family while walking in the royal footsteps of the past.

For me, this journey was more than tourism. It was a pilgrimage to a shared heritage, an affirmation of the cultural links between Bangladesh and the Mughal heartlands of India, and a reminder that food, family, and history are threads that tie us across borders.

Aspiration vs Sooth:
The Chronicle of Real-Life Stoicism

Jannateen Naoar Siena
Lecturer
Department of Public Administration

It's a beautiful morning in 2005, and you are a kid standing on the balcony. You see them, including your father, going to the office wearing blue uniforms. As a child, you feel blessed to witness the beautiful scene of blue folks walking under one infinite blue sky every day. Fighter jets flying over the sky, you just run towards the window, towards the balcony, and sometimes you make it to the terraces, hearing it coming. All of these inspired and amazed you, and you set your mind on believing this is your only dream. You are determined to save your motherland, no matter what it costs you, your life. From playing with paper cutting to being a real warrior of this blue paradise, the phases are not easy. Each step needs patience, dedication and hard work. Likewise, another soul is working hard to achieve his goal of wearing the prestigious green one to serve his nation, his motherland.

To some extent, he succeeded. However, the wakeup call of uncertainty made him lose the key. The lesson taught: not everyone is that lucky to fly high above the blue sky, or even to have the chance to wear the desired uniform to serve the country. So are they!

'There are two groups of people in this world,
One group wanted to fly, and the other could.'

Eyes shedding tears, unbearable pain of a lost dream! Can you close your eyes now to imagine yourself there? Tell me how it feels.

-Heart Aches!

Yes, it's hard to believe, to accept such facts. A question thus arises in mind – 'Why, me?' where we do not get the answer at that time. But the Almighty has planned something else, probably something big. Let us know from the tale –

Two unknown individuals, with the same motto of serving their homeland, did not even know the will of the creator. They did not know where life was taking them, in which direction! To them, the phase of getting admission to universities was kind of a disaster. Broken on the inside, the pressure of studying, etc., felt like hell. After that grievous period, the new chapter began in their university life. New place, new people, some problems with adapting to the environment; nevertheless, friends, stories of bonding, and the experience as a whole contributed to a memorable experience, including learning. Struggles, whether too little or the hardest ones, make them capable of facing and overcoming obstacles. Moreover, the strangest yet best part is that both individuals have started their professional lives as lecturers in the same department, even at the same University. Yes, you got it right. The Almighty has given them one of the finest ways of serving their country, a noble job which they could not imagine before. It was his blessing that he had given to these souls. The two individuals who have had their dreams shattered could not stop believing in the creator despite heart-wrenching feelings.

SAUFEST 2020: More Than Just a Fest

Muhammad Nafis Shahriar Farabi
Lecturer
Department of Economics

Owing to my contributions to the Department of Economics, I was selected to represent both Bangladesh and BUP at the 13th South Asian Youth Fest (SAUFEST), hosted by Kurukshetra University in Haryana from February 24 to 28, 2020. The occasion was historic for BUP as it marked our first appearance at the festival, and personally unforgettable for me, as it coincided with my very first trip abroad. I was accompanied by two fellow BUP students–Shamrir Al Af from the Department of International Relations and Anika Tasnim Prapti from the Department of Development Studies.

SAUFEST is an event organized by the AIU (Association of the Indian Universities) to promote active collaboration and mutual understanding among the South Asian countries across various disciplines. It provides a common platform for the participants to share views, ideas, and cultures with participants from different countries at the fest. That year, around 700 students across the region participated in the event. Our Bangladesh team was one of the largest, with 98 students making up the contingent. Everywhere you turned, the place buzzed with excitement and enthusiasm. Events spanned across many categories: debates, poster presentations, cultural performances, dance, music, and seminars. I took part in the poster-making contest, putting my heart into a piece that highlighted the linguistic heritage of Bangladesh's diverse communities across the country's regions.

The host university left no stone unturned to make this event successful. All the volunteers were very cordial and attentive, ensuring that participants felt comfortable and welcome. Alongside the fest, we were given the chance to explore Kurukshetra's historic and spiritual landmarks. The place is renowned for its close association with Hindu mythology. We visited sacred sites such as Brahma Sarovar and Jyotisar. Brahma Sarovar is considered one of the most sacred water bodies in Hinduism and is a fusion of legend, history, and mesmerizing scenic beauty. Jyotisar is believed to be the ground where the Mahabharata's epic battle initiated and is considered the birthplace of the Holy Bhagavat Gita. We witnessed dramatic reenactments that transformed ancient legends into lived experience. It helped us connect with the history of the region, and we encountered the living legacy of a civilization.

One of the most fascinating aspects of Kurukshetra was its food. Being a land of strict vegetarian tradition, we were served a wide range of dishes that were simple yet flavourful. Soyabean curry, makki ki roti, chickpea curry, dum aloo, paneer curry, raita, and kulcha were some of the food items that we got to taste. Fresh from the fields, the meals reflected the agricultural roots of Haryana. If you ever visit this part of India, make sure to indulge in its vegetarian cuisine. It's an experience not to be missed.

Beyond competitions and cultural showcases, the best part of the fest was about the people. The friendships forged with participants across South Asia, the exchange of laughter despite language barriers, and the experience of unfolding India's cultural diversity firsthand were simply phenomenal. Interacting with the participants from other countries, I never felt any kind of hostility toward Bangladeshis; rather, they expressed their genuine interest in visiting and exploring our country. AIU warmly acknowledged the participation of such a large contingent from Bangladesh.

The event concluded with a grand closing ceremony with mesmerizing performances by International and Indian participants. All the participants were also awarded at the closing ceremony. The BUP team received gold medals, mementos, and certificates from the chief guest of the ceremony.

The most unforgettable twist in our journey came just as we were about to return home. A group of 37 from the Bangladeshi contingent, including me, missed our scheduled flight from Delhi to Dhaka. Panic set in quickly. Many of our visas were due to expire within a day, and the city was gripped by violent communal clashes, some of the worst in decades. Stepping outside the airport didn't feel safe.

To make things worse, we didn't have enough funds for new tickets. Booking another flight seemed nearly impossible. But with determination, teamwork, and by the grace of Almighty Allah, we somehow managed to collect the needed funds and confirmed seats on a Biman Bangladesh flight for the following day. Throughout this chaos, our team manager from UGC, Hafiz Sir, remained calm and decisive, guiding us with remarkable

patience. The Biman Bangladesh authorities and the Bangladesh High Commission went out of their way to help us. They arranged meals and provided us with a safe place to spend the night inside the airport.

What could have been a night of despair turned into an unexpected memory. We barely slept, but conversations and jokes filled the long hours. Meanwhile, our families in Bangladesh waited anxiously for us. When we finally landed in Dhaka, the air felt sweeter than ever. In that moment, we realized the true comfort of returning home.

Looking back, SAUFEST was not simply an international festival. It gave me lessons in patience, the joy of cultural diversity, and bonds of friendship that will remain etched in my heart forever.

Marketing: The Art of Psychology

Israt Jahan Dina
Lecturer
Department of Business Administration–General

Picture a woman walking through the front door of a boutique. As she roams the store, a soft voice catches her ear. An ardent salesperson comes over, holding a handcrafted aroma candle! 'This is more than a fragrance,' she says. 'It's an experience–a moment of stillness in a hectic life, a means of making serenity in your home.' While the salesperson is talking, she imagines a picture of calm nights and restful sleep in her mind. The woman pauses; at first, she doesn't need another candle or a quiet moment, and she hadn't intended to pursue. However, the salesman's sympathetic tone and the carefully calibrated language make her give a second thought. The salesperson adds, 'This aroma candle indulges your home with sophistication, and your home bespeaks your personality.' Without even realising it, the woman is lured by desire. Her subconscious mind discovers an emotional need for peace and a small luxury that pledges her life will be better. She exits the store with a Jasmin fragrance candle in hand, assured that this small treat will bring peace to her chaotic world. Thus, psychological marketing redirects the attention from selling a product to uncovering hidden desires, awakening unidentified needs, and gently helping them to emerge into the realm of authentic desire.

The world's most successful brands establish emotional connections that go way beyond utility. People don't want to discuss the product anymore; rather, they want to feel how it adds value to their lives. In the first scenario, the lady was being told how an aroma candle can enliven her personal and social life. She didn't buy a candle; she bought the essence of calmness and luxury. Every brand carries a personality. The most important task of the marketer is to strengthen the association between brand personality and consumers' personality. Consider how Apple's gadgets are more than just tools for making calls; they present themselves as gateways to creativity, freedom, and invention. The swoosh of Nike is more than a logo; it's a symbol of the resiliency of the human spirit. It represents who you want to be and what you want to achieve. These brands don't simply sell products; they intertwine with our identity and make us feel understood, empowered and connected to something bigger than ourselves.

As emotion mingles with intellect, psychological tools are the master architects of persuasion. Over the years of experience, brands have learnt the skill of leveraging cognitive biases, like authoring scarcity (creating FOMO–Fear of Missing Out) and appealing to social proof (i.e., testimonials, reviews, endorsements of any kind) to support our decisions. Moreover, different colours are even chosen deliberately to associate with certain emotions: white as a colour of purity or simplicity, and green as a colour of growth or prosperity. Carefully crafted phrases position products as essential rather than optional, embedding them in the consumer's sense of necessity. Utilising both our conscious wants and our subconscious fears, they directly and indirectly move us, many times without our conscious realisation.

The way of doing branding is taking a new turn with the integration of AI (Artificial Intelligence). Nowadays, branding is more dynamic, data-driven, and personalised. This human-mimicking technology has made it possible to reach consumers in real time and more accurately through advanced analytics and digital platforms. Additionally, AI can find patterns and predict new trends of consumer behaviour that can clearly distinguish the consumers from one generation to another. Moreover, machine learning algorithms have improved the design and consistency of brand elements like names, logos, colour schemes, taglines, etc. It anticipates the best

probable combinations of a brand that resonate with the target audiences. The collaboration of AI has made it possible to provide a better experience of a brand, simultaneously saving cost and time.

Even though artificial intelligence has brought unparalleled change in personalising customers experiences and optimising marketing strategies, it still falls short in terms of the nuanced creativity, emotional intelligence and cultural awareness that human beings can bring to the table. Much of branding depends on human instinct, societal trends, and subliminal messages. The interpretation of this poses severe challenges to AI. While the AI is rising in triumph, one important question predominates–'Will AI ever be better at understanding what consumers are thinking, and can technology ever match or surpass the nuanced insights and empathy that human marketers bring to their audience?'

In essence, marketing is more than selling or promoting any product; it is an art rooted in discovering unspoken thoughts and delving into the human soul. It's about reading between the lines. When consumers recognise that every product is a conduit for emotion, they unlock a power far greater than mere sales. They become part of our stories, our dreams, our very identity. Integration of AI has become an undeniable part of this process. Unquestionably, this has given an extra perk. However, marketers and consumers both need to understand when and to what extent AI should be applied. Once, the famous Chinese military general and strategist Sun Tzu said–

'He will win who knows when to fight and when not to fight.'

Freedom of Speech or Hate Speech: How Do We Draw the Line?

Md. Tanvir Mahtab
Lecturer
Department of Sociology

In any democracy, freedom of speech is regarded as a vital element of civic life. It allows individuals to express opinions, hold authorities accountable, and participate in open discussions without fear of punishment. Yet, this liberty is never absolute. The challenge emerges when speech shifts from healthy dialogue into a means of exclusion, dehumanization, or incitement to violence. In Bangladesh, where democracy has developed under difficult conditions and where religion, politics, and culture are deeply intertwined, finding the balance between protecting free expression and curbing hate speech remains one of the most pressing social and political challenges today.

Sociologists like Jürgen Habermas highlight the crucial role of free expression within the *public sphere*—a space where citizens participate in rational dialogue to shape governance. In this arena, ideas are not prematurely dismissed, allowing truth to surface through open discussion. From a functionalist standpoint, free speech also helps sustain social order by providing an outlet for grievances instead of suppressing them. In contrast, symbolic interactionists emphasize that language is more than abstract thought; it carries meanings that shape identities, relationships, and social hierarchies. As a result, speech can become a mechanism of exclusion. Critical theorists, particularly Michel Foucault, add another layer by arguing that discourse embodies power as well as communication, with ongoing struggles over who is allowed to speak, what can be said, and what must remain unspoken. Viewed through these perspectives, the issue becomes clearer: freedom of speech is not only a matter of legal rights but also a sociological concern. It reveals the dynamics of power, the points of cultural conflict, and the boundaries of tolerance within a society.

Debates over speech and censorship have long been prominent in Bangladesh. The nation is known for its vibrant political discussions, deep literary traditions, and active civil society. Yet, history also shows that expressions linked to religion, ethnicity, or politics can quickly spiral into violence. A striking example lies in allegations of blasphemy circulated online. Over the past decade, claims of insulting religion on social media have repeatedly sparked mob attacks, often targeting minority communities. The 2012 Ramu incident, where a Facebook post allegedly mocking Islam triggered large-scale violence, illustrates how rapidly words can escalate into collective aggression. In such moments, freedom of expression and hate speech collide dramatically: a single message, real or fabricated, has the power to mobilize thousands and unleash devastation.

From Durkheim's perspective, such violence represents more than spontaneous anger; it reflects a form of collective effervescence, where communities reaffirm their sacred values by punishing those seen as violators. At the same time, it underscores how fragile the boundary is between safeguarding religious symbols and fuelling hostility toward vulnerable groups.

Hate speech goes far beyond offensive remarks. From a sociological lens, it produces real social consequences: normalizing prejudice, reinforcing harmful stereotypes, and stigmatizing certain identities. Erving Goffman's concept of the *spoiled identity* sheds light on how derogatory language assigns damaging labels that portray particular groups as threatening or inferior. The treatment of Rohingya refugees in Bangladesh illustrates this clearly. Terms like *bohiraagoto* (outsider) and repeated accusations of criminality have shaped public

perception, often justifying their exclusion from wider society. While some citizens may hold genuine concerns about resource distribution, such discussions frequently slip into xenophobic narratives. What may begin as an expression of frustration can, over time, sustain enduring structures of discrimination. Partisan politics in Bangladesh offers another example. It is common for political rivals to be branded as *rajakar* (traitor) or 'anti-liberation,' framing opposition as betrayal. This practice erodes the space for genuine debate and transforms free speech into a weapon of hostility. Conflict theory helps explain this tendency: political elites manipulate language to consolidate their authority while delegitimizing opponents.

The basic question is: how can we protect free speech while also reducing the harm that hate speech causes? According to John Stuart Mill's 'harm principle,' communication should be free unless it directly hurts someone else. Still, putting this into practice in Bangladesh is not easy. When religious feelings are easily 'hurt,' where should we draw the line? Should criticism of a belief system be stifled because it might offend, or should it be allowed to encourage critical thinking? The sociological response requires subtlety. To keep democracy strong, it is important to protect free speech. However, when speech consistently suppresses voices, provokes violence, or undermines social harmony, collective intervention becomes necessary.

The Digital Security Act (DSA) was intended to regulate what people can say online. Its stated purpose is to fight hate speech and lies, but it has often been used to suppress people who are critical, such as journalists and activists. This is similar to what Foucault said: people in charge decide what discourse is acceptable. The challenge is to make sure that policies meant to stop hate speech aren't exploited to silence dissent.

Bangladeshi youth movements have used a variety of methods to deal with this boundary in recent years. The 2018 Road Safety Movement, for example, showed that people can voice their concerns without turning to hate speech, whether it's in person or online. Instead of going after a specific religious or ethnic group, students used fair arguments, evidence, and moral appeals. This means that it is possible to create a Habermasian public sphere in Bangladesh, but only if civic standards for discourse are put in place. In this case, education is quite important. When students learn to tell the difference between criticism and hate, as well as between challenging ideas and attacking identities, it is easier to keep the line.

Ultimately, freedom of speech and hate speech are not opposed, but rather points on a scale. In Bangladesh, the balance should favour protecting free expression while establishing strong protections against incitement and exclusion. This demands three commitments:

1. To ensure legal clarity, laws such as the DSA should target hate speech specifically, rather than silencing criticism.
2. Civic education: Citizens, particularly youngsters, should learn to negotiate debates constructively and recognize the dignity of multiple identities.
3. Cultural responsibility: Media, political leaders, and public personalities should be held accountable for their language, as it has a significant social impact.

Freedom of speech is essential for the self-correction of civilizations; yet it must not be a justification for hatred. In Bangladesh, where there are many religions, political rivals, and a shaky democracy, the line between freedom and enmity is thin but clear. Our goal is to carefully manage it while following the principles of respect, fairness, and discussion.

Where They Live

Faria Binte Yousuf
Student
Department of Sociology

Have you ever wondered what would happen if you ever found a cave full of treasure? Yes, I did. I spent most of my childhood in a world of fairy tales. I used to look for those little fairies in the trees and for mermaids in the Padma River. And talking about looking for treasure, I kept that for the future. I always thought that when I grew up, I would go to Egypt and find my treasure. Maybe this is why the book titled 'The Alchemist,' written by Paulo Coelho, has become one of my favourite books. When I was a child, my family and I used to spend at least one month at our grandparents' house in Rajshahi. Their house is in a village called Amnura. A village that still fascinates me. Maybe for finding fairies and discovering the secret of nature, my sister, my cousin, and I liked to roam around the village. It was a winter day, and we three got out again to roam, this time going far from our house. Suddenly, our eyes were stuck in a place, a road of mud that went straight, and a big place covered with so many trees. We could not suppress our curiosity and followed the road to go inside. As soon as we went inside, it didn't feel real. It was like a little village surrounded by so many trees that people from outside could not see the inside. All the houses were made of mud, and in the centre of that place, there was a big pond. We were amazed by nature, and I was sure that this was the place where I could find fairies. I suppose, 10-15 minutes had passed when we suddenly realized that in that place, neither a single person nor an animal was there. It was the time when my fairytales became horror movies, and we suddenly, without warning each other, ran out of the place as fast as possible. When we were running, we saw three people on the main road and decided to run towards them, since we only wanted to see humans at that time. As soon as we got close to them, we discovered another fear. There were three females, and their skin was so dark that I had never seen so many dark-skinned people before, and each one of them was holding a chopper in their hand. All of them were looking at us without blinking. Maybe they have noticed the fear on our faces. We didn't stop running there; we ran directly to our house. As we got close to our house, our grandmother asked us what had happened and why we were running. We explained everything to her, and she mentioned that the place was abandoned by the villagers, as there is a rumour that whoever enters it after dark never comes out alive. She warned us never to go there again.

Next year we will go again to the village to spend our vacation. Amnura is where you can see a harvest year-round. The people of that village live their lives based on agronomy. I was sitting outside our house, watching people irrigate. Suddenly, I noticed some dark-skinned people doing that work in our field, and one of them was the person I saw last year. At lunchtime, my grandmother cooked food for them, and they received lunch and some money in return for their work in the field. That woman came towards me, smiled, and asked me, 'How are you?' Her tone, accent, and dress were different from ours. She had brown eyes and long black hair, and suddenly she seemed like the fairy who might have come from another universe. Her beauty had no definition, and her muddy hand on my head gave me those motherly feelings. After lunch, when they again went to work, I asked my grandmother who they were.

Why are they different from us? That time, she mentioned that those people were a tribal community called 'Santal' who lived in that village, and that they earned their livelihood by working in other people's fields. They are mainly what we call "Banglar Krishok". After that, every year when I went to my grandparents' house, I liked to talk to them, work with them in the field, and laugh with them. As I grew up, I realized that they are the treasure of our country; every cultivator is a treasure of our country. We have to protect them. We have to remove every discrimination against them. We have to make the country livable for them as well.

In Praise of Ordinary Days

Rasel Mahamud
Student
Department of Mass Communication and Journalism

There is a peculiar loveliness in ordinary days, the kind that is passed over unless we choose to sit and pay attention. Not every dawn must herald a revolution, not every conversation must redefine the course of our lives, and not every evening must be painted in cinematic hues. At other moments, it is in the gentle beat of routine, the steaming cup of chai in the morning, the pendulum swing of a rickshaw along a crowded street, or the silent turn of pages in a notebook that life whisperingly speaks its kindest truths.

My mornings tend to begin with the aroma of chai wafting from the little pot on the stove. The first sip is always warm, reassuring, and a little bitter, a reminder that life itself is a mixture of sweetness and effort. Outside the window, the neighbourhood comes to life in slow motion. The birds chirp from the mango tree, clothes flail in the air, and the distant hum of traffic provides a soft background rhythm. To the outside observer, these scenes can appear routine, even humdrum, but they are tinged with the weight of profound satisfaction. They are a reminder that the world continues, unchanged and forgiving, whether we are preoccupied trying to achieve some great success.

Evening or late-afternoon walks are another hymn to the poetry of the ordinary. The pavements go by familiar faces veggie vendors fanning out fresh vegetables, children skating through puddles, street cats tending in and out of sunlight. My thoughts wander off in a daydreaming session about how the petty intricacies of these walks a yelping stray dog, the crisp sound of dry leaves, the guffaws of laughter from a tea stall a block or two away comprise the sublime poetry of life. Each step on the rough sidewalk appears to ring with a little truth: that it is the ordinary and not the amazing that counts.

Deadlines are a part of the texture of mundane days, even if they come most often with apprehension and all-nighters of coffee. The finish of a report, the delivery of an e-mail, or the fulfilment of a small commitment can be a moment of no significance in the larger plan. But those small victories add up to a feeling of accomplishment. I've learned to love the pleasure of checking something off a list, in the late-night warmth of a laptop screen, or the scratch of a pen on paper. Ordinary days are held together by those small joys, and they form a texture, when reflected on, which appears complex and comforting. There is also something strange in the repetition of the routines of every day, the morning with family at the breakfast table, the casual conversation with a friend on the phone, the night ritual of watering plants on the balcony. These routines don't thrill like something extraordinary, but they provide nourishment for intimacy, predictability, and a sense of belonging. A mother scattering rice in a wok, a father reading the newspaper by the window, a sibling laughing at a hundred-told joke, is this part of everyday life summed up to a larger soft story?

Perhaps the most underappreciated glory of every day is its predictability. The world hardly ever stops turning, and yet the little rhythms repeating themselves offer comfort. The clock strikes on, the sun comes up, the kettle blows its whistle, the streets stir. In the beat there is confidence:

"There is life, and in its rhythm, we can discover room to be still. Every day reminds us to breathe, to observe, to savour. They do not have to be epic in any way on their own account; they require nothing of us but that we stay present in all of it."

I've come to understand that the anomalous somehow writes itself into the ordinary in advance. The stranger's smile, the rain shower on a dusty day suddenly the smell of bread from the neighbourhood bakery are these trivial events that interrupt the routine and illuminate it. And it is very much because of their amplification that it takes place neither as a result of their rarity, but because of their inscription into the ordinary. It is there that the rhythm of daily life makes everyday life come alive.

To applaud ordinary days is a gesture of gratitude. In learning to be grateful for the familiar routines, we see that the day does not need fireworks or banner news to be meaningful. A cup of chai, a daily journey walked alone or with the one we love, the peaceful fulfilment of the day, these small miracles sustain us. They teach us the disciplines of patience, concentration, and awareness. They allow us to bask in the here-now without the chase for the marvellous.

We allow ourselves room to dream without haste, to feel without distraction, to touch without publicity. The daily is never really daily if we pay attention to the laughter of a child ringing down a vacant street, the shining beam of the sun on a student's worktable, the gentle scratch of a pen creating words on paper. We don't need the day to be something special every single day; the quiet beat of ordinary days suffices. So, I learn to appreciate mundane days. I celebrate the normalcy, the due dates, the walks, the chai cups, and the tiny breaths in between. There, I discover rhythm, comfort, and profound joy that good days cannot surpass. Daily days are life's waiting room; they are daily life unwinding forcefully, tenderly, graciously. And maybe the most important thing they show us is this: we don't require any spectacular moments to be alive; occasionally simply existing in the mundane is enough to be something remarkable.

Graduate Anxiety: Life Beyond Graduation in an Uncertain Job Market

Umama Baida
Student
Department of Sociology

As a new graduate, I carry not only the joy of success, but also the burden of uncertainty. Along with the pride of completing my studies comes a deep sense of frustration, insecurity, and anxiety–something many of us are all too familiar with when entering an unpredictable job market. Not only in Bangladesh, but many around the world go through the same frustration, insecurity, and anxiety after completing their undergraduate degrees. Students have worked so hard for years, and suddenly, instead of stability, they face uncertainty–'What next? Will I get a job? Am I enough? Did I study the right thing?' These questions can be overwhelming.

Graduating means crossing a threshold into adulthood–a mix of pride, relief, and excitement. But often, that joy is mixed with something else: frustration, insecurity, even fear. After I graduated a few years ago, I felt that mix of anxiety–the pressure to find a stable job, the uncertainty of what's next, and the question of whether I'm ready for what's ahead.

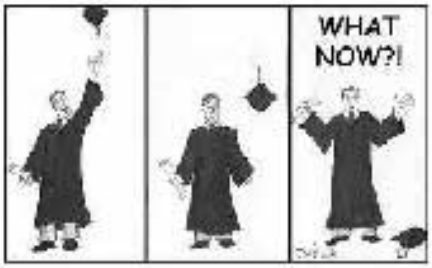

Recent reports show that graduates today are facing a cold and highly competitive job market. Employers are offering far fewer entry-level positions–sometimes almost flat compared to previous years–which limits opportunities for first-time job seekers (Guevara, 2025).

In the UK and US, graduates have to contend with artificial intelligence-powered filters and systems that screen applicants before they even see their CVs (The Guardian, 2025; Financial Times, 2025). This has created a 'graduate grind' where hopefuls submit hundreds–even thousands – of applications but receive little response or success (The Times, 2025). Economically, these challenges are reflected in rising rates of youth unemployment and underemployment. In the United States, unemployment among 22-27-year-olds, compared to degree holders, has reached its highest rate in decades. Many are resorting to part-time or temporary jobs and questioning whether their degrees are still worth it (Washington Post, 2025).

Anxiety in Bangladesh: A Hidden Burden

Research has shown that individuals with high intolerance for uncertainty–the tendency to feel anxious about unknown outcomes–experience higher levels of anxiety during transition periods such as graduation (Chen & Zeng, 2021). However, career planning can provide a buffer against this anxiety. Graduates who develop clear career goals and strategies report lower levels of anxiety even in the face of uncertainty (Chen & Zeng, 2021). In Bangladesh, targeted career development education–programs that help students determine their career paths and expectations–has been shown to reduce job anxiety, even when job uncertainty and frustration still act as factors (Khan et al., 2024).

This moment–though unsettling–is also an opportunity for rewriting. As graduates, we're not just starting our careers; we're redefining what success looks like in a world transformed by technology, uncertainty, and

shifting values. Your passions, your coordination, even your rejections are data points that can guide others–colleagues, institutions, policymakers–to a more humane, informed transformation environment.

It's a hard truth that there is no one-size-fits-all strategy to avoid the anxiety that graduates face in today's uncertain job market. No handbook or single formula can guarantee stability or success. Frustration and insecurity are real–deeply felt by countless young people who find themselves on the brink of uncertainty after years of study. While career advice, planning and skill development can help, the emotional burden of not knowing what comes next often remains. This reality reflects a generation caught between success and unpredictability–carrying both hope and fear into an uncertain future.

It's a truth we can't ignore–there is no specific or universal strategy for overcoming the anxiety that graduates face in this unpredictable job market. Each person carries their own burden of uncertainty, and no single formula can erase it. Still, while there may be no perfect solution, there are ways that can reduce the burden. Acknowledging our emotions rather than hiding them is the first step toward healing. Building supportive networks with peers, mentors, and alumni can open unexpected doors. Engaging in ongoing skill development, whether in digital literacy, communication, or problem-solving, can strengthen our adaptability. Seeking mental health help when needed reminds us that anxiety is not a weakness but a part of humanity. Above all, we must learn to embrace uncertainty as part of the journey, not as a dead end. Being a graduate doesn't mean having all the answers–it means having the courage to seek them out, even in an uncertain world. And perhaps that courage itself is the beginning of our success.

Reference :

Guevara, E. (2025). *The Graduating Class of 2025 is Entering an Uncertain Job Market*. Investopedia. https://www.investopedia.com/the-graduating-class-of-2025-is-entering-an-uncertain-job-market-11727142?utm_source

Lim, S., Strauss, D., Burn-Murdoch, J., & Murray, C. (2025, July 24). *Is AI killing graduate jobs?* @FinancialTimes; Financial Times. https://www.ft.com/content/99b6acb7-a079-4f57-a7bd-8317c1fbb728?utm_source

Armitage, J. (2025, July 6). *A thousand applications to get a job: the graduate grind*. Thetimes.com; The Sunday Times. https://www.thetimes.com/uk/education/article/a-thousand-applications-to-get-a-job-the-graduate-grind-c6hkm8nv9?utm_source

Telford, T. (2025, June 26). *Facing entry-level job crunch, new grads question the value of a degree*. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/business/2025/06/26/graduates-degree-value-job-market-ai/?utm_source

Chen, L., & Zeng, S. (2021). The Relationship Between Intolerance of Uncertainty and Employment Anxiety of Graduates During COVID-19: The Moderating Role of Career Planning. *Frontiers in Psychology*, *12*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.694785

Khan, M. M., Chowdhury, M. S., Kumar, S., & Affia Jahin. (2024). *Does-Career-Development-Learning-Reduce-Job-Anxiety-Among-the-Graduates-of-Bangladesh-Uncovering-the-Underlying-Mechanisms-1*. *52*(5), 4–16. https://www.researchgate.net/publication/387735642_Does-Career-Development-Learning-Reduce-Job-Anxiety-Among-the-Graduates-of-Bangladesh-Uncovering-the-Underlying-Mechanisms-1

Murder, Dinner, and Other Problems

Lum Yea Hossain Ankona
Student
Department of Business Administration in Management Studies

There's something both tragic and hilarious about being in your twenties. You're too old to cry in the shower over a heartbreak, and yet too young to make weekend sleep-ins your only luxury. You're the responsible adult now, the one who kills the bug in the corner of the room or at least negotiates with it like at a UN peace summit. Earlier today, I sat staring at a beetle on my floor. The real dilemma wasn't whether I should kill it. But something larger, almost absurdly moral: *Am I capable of murder? Or will I live the rest of my life knowing this beetle and sharing a room now?*

That's the thing about your twenties: every small decision suddenly disguises itself as philosophy. Should I keep drinking black coffee for breakfast? Should I cut off friends because our beliefs no longer overlap, or am I just unreasonably difficult? What's for dinner, and why does deciding that feel as pressing as deciding my career? Why do I lie awake at night bargaining with time itself, asking it to slow down just long enough for me to figure out who I am?

At 23, I am just a three-year-old adult–barely walking, still tripping, and already terrified of regrets. I clean the dust off the stack of books I swore I'd finish, but every morning the dust returns, stubborn as my own inconsistency. A pile of laundry rests on my study chair for weeks, begging to be neatly folded. I don't know if I am cultivating self-worth or performing it.

But sometimes, trespassing all the self-loathing, I notice myself smiling at stray dogs on the worst of days. I scroll past horrors of genocide with disturbing detachment yet feel a terrible ache at injustice and a desperate need to keep my soul from corroding. I lie to myself and to the people I love, but I also love with a depth that remakes me. I changed my mind. I allow new ideas to reshape me. And in that contradiction, I wonder if maybe–*just maybe*–trying is enough.

Life in your twenties can be best described as a cipher. Every clue–the beetle, the coffee, the unread books–points not toward the answer of how to live, but toward the quieter, harder question: *how to keep living when the answers don't exist.*

Sometimes, in rare flashes of clarity–say, with Bob Marley playing in the background, the realization dawns on me: if I die in my twenties, chances are I'll have accomplished nothing remarkable. So, there's always this chance that no matter how hard I try, I will remain insignificant, ordinary, and forgettable. This pessimistic thought has been the source of my greatest relief. What if time is not rushing ahead of me at all? Perhaps it's keeping pace, carrying me exactly where I am supposed to be–and the trick is to look at my watch less often. Maybe the simple act of accepting that the pile of clothes will still be there, tomorrow is not resignation, but wisdom. Maybe life will never give me a better answer than that.

It makes you think. What if the 'twenties' is a capitalist propaganda, and our thirties or forties are all equally confusing, if not more so? I cannot dismiss the possibility that this is the most clarity we'll ever see. And trying to live through every day as it is, is enough.

If that's true, then maybe the most radical act of survival is *presence*. If so, I would like to gently bid goodbye to all my regrets and go out with my friends on a random Tuesday. I will forgive myself for not doing the laundry yet. If only someone confirmed this to be the truth, I would know that as long as I am alive, I have time. Only as long as I am alive.

Zero-waste Lifestyle : Can Students Really Do It?

Fyruz Yazdani Shukria
Student
Department of Disaster Management and Resilience

The concept of a *'zero-waste' lifestyle* has gained momentum worldwide in the fight against climate change and pollution. It refers to a way of living that minimizes the amount of waste sent to landfills or incinerators by reusing, recycling, and refusing unnecessary items. But can students living on limited budgets, in shared spaces, and with busy schedules realistically embrace this lifestyle?

Why Zero-waste Matters

Globally, humans generate about 2.24 billion tons of municipal solid waste per year (World Bank, 2022), and much of it comes from packaging, single-use plastics, and food waste. Universities are not exempt: cafeterias, dormitories, and campus events contribute heavily to daily waste streams. Reducing waste on campus isn't just about saving the planet. It also saves money and fosters healthier, more sustainable communities.

Opportunities for Students

Despite the challenges, students are in a unique position to adopt sustainable habits:

- **Campus Infrastructure:** Many universities provide recycling stations, refill water dispensers, bike-sharing programs, and second-hand bookstores.
- **Youth Leadership:** Students often lead sustainability movements, organizing campaigns, clean-up drives, and awareness programs.
- **Everyday Habits:** Carrying a reusable bottle, saying no to plastic bags, buying second-hand clothes, or meal-prepping instead of relying on packaged snacks can cut down waste significantly.

Barriers Students Face

While the zero-waste idea is inspiring, students face fundamental limitations:

- **Budget Constraints:** Eco-friendly products (like bamboo toothbrushes or metal straws) are often more expensive upfront.
- **Time Pressure:** With classes, exams, and part-time jobs, cooking fresh meals or carefully sorting waste may feel impractical.
- **Limited Facilities:** Dorms may lack composting or recycling options, and nearby stores may not offer bulk or package-free items.
- **Social Norms:** Events and celebrations on campus often involve single-use plastics, making waste avoidance difficult.

Practical Tips for a Student-Friendly Zero-Waste Lifestyle

- **Start Small:** Focus on easy swaps, use a reusable bottle, avoid straws, and carry a tote bag.
- **Go Digital:** Save paper by taking notes and submitting assignments electronically when possible.
- **Thrift and Swap:** Buy clothes and furniture second-hand or join swap events with friends.
- **Meal Smarts:** Cook in bulk, share with friends, or store leftovers in reusable containers.
- **Advocate Together:** Push student organizations and university authorities to adopt greener event policies and provide compost/recycling facilities.

The Realistic Goal: Low-Waste, Not Zero-Waste

The truth is that a perfect zero-waste lifestyle may be out of reach for most students. But that shouldn't be discouraging. The focus should shift from perfection to progress. A '*low-waste*' lifestyle, where each person does what they reasonably can, creates a larger collective impact than a few individuals living waste-free in isolation.

So, can students really live a zero-waste lifestyle? Perhaps not in the strictest sense. But by making conscious choices and pushing for systemic changes on campus, students can get much closer to the goal. The journey isn't about fitting a year's trash into a jar; it's about building a culture of sustainability, one small step at a time.

Anecdotes of Ultimate Odyssey

Nafisa Tabassum Maisha
Student
Department of Economics

People see me as an omen of misfortune, always bringing grief and plundering treasured possessions. Despite taking people to their destiny, I can never bring others around them joy, nor get them to bid smiling farewells. Instead, it appears I turn whatever delight and bliss they have into painful remorse and inconsolable misery. I really don't understand why everyone seems to be so dismayed when someone starts for their ultimate destination. But as I saw more of them, I gradually began to grasp an idea.

The day I had an air of being gloomy with persistent drizzling, I carried a little girl, seemingly eight years old. Even the white cloth shrouding her couldn't hide how small she was. I heard hushed voices talking about how her laughter and vibrancy have been lost forever. She was the only daughter of her parents, born after six years of their marriage. Who knew that their silver of light would be snuffed out by a car speeding through the wrong lane? That day, I was confused about whether taking her away was the best thing to do.

Last month, I carried a man, quite aged. Amidst the crowd of people present, I noticed a little boy sobbing out loud, 'Anna bhai, please don't go. I won't let papa leave you again at that place where you were all alone. I know how sad you were. Please stay, I won't let you go again. It's a pinky promise.' Though I didn't get what the boy meant, I could feel how hard he was holding on.

Now, let me share a memory of carrying a middle-aged man. For the first time, I saw such a huge gathering. Most were dressed in olive green. I was surprised when a green and red colored cloth was spread over me. The hollow silence in the air was punctuated by piercing shots, twenty-one in a row. Beside me, a woman was quietly shedding her tears while holding a two-year-old child whose glossy eyes were staring incomprehensively with so many questions. Maybe preparing for the next?

At this point in my life as a 'Coffin', I finally realized why people are so reluctant to move on to where they really belong. It's because when they depart, the void present in the hearts of the people they leave behind becomes a painful reminder of their absence. As I carry people to a great unknown, I wonder what their purpose in life was and what mine is.

Adventure in the Sundarbans

Ummay Muktazun Sobhan
Student
Department of Disaster Management and Resilience

Travel always has its own charm; sometimes it tests courage before rewarding us with its beauty. My journey to the Sundarbans with a few friends in October 2025 was exactly that; an adventure painted with drizzle, high waves and the wild beauty of the Sundarbans. What made it more unforgettable was that it all happened in the middle of Cyclone Dana's signal no 3 warning.

The trip began at the Mongla Port, where excitement buzzed louder than the cyclone warning. We boarded an engine boat and were enjoying the moody sky draped with Gray clouds. The boat slowly entered the Pasur river. The view of Pasur River was breathtaking; it flow between the two endless stretches of the Sundarbans. Sometimes, the waves rose higher and rocked our boat like a cradle. Instead of fear, we enjoyed the smell of wet earth, cool breeze, the uninvited guest 'rain', splashes of water against the boat, which altogether created a beautiful atmosphere that words could hardly capture.

Our first destination was Herbaria Point. Here, we picked up a local guide for our safety. Every step deeper into the mangrove forest was like stepping into another green world, which is enriched with diverse wildlife. The local guide introduced us to the diverse plants like Sundri, Golpata, Garjan, Gewa, Goran and so on. We were eagerly waiting to see the majestic Royal Bengal Tiger, but luck wasn't on our side that day. Though, we quenched our thirst by finding a pugmark of the Royal Bengal Tiger. The watchtower of Herbaria Point gave the opportunity to enjoy the panoramic view of UNESCO's world heritage site.

After enjoying the picturesque view, we boarded the boat again to see Karamjal point. At this point, we explored the wildlife breeding centres, suchas deer and crocrdiles. Some of us eagerly fed grass to the deer and watching them so closely felt almost magical. Then we went for a walk on the trail. With every step, the sound of the outside world faded away, leaving only the whispers of wind and chirping of the birds. The drizzle added another layer of beauty that made the Sundarbans feel even more magical.

While the natural beauty of the Sundarbans was breathtaking, the trip also opened our eyes to the struggles of people who live there. Beyond the dense forests and wildlife lies a human story that often goes unnoticed. We noticed how people in these remote areas face daily challenges like freshwater scarcity, absence of treatment facilities, poor communications and so on. Their house is fragile, most of which are made up of straw and bamboo, which makes their house vulnerable to frequent storm surges, floods, or cyclones. The basic rights of healthcare and education seem to be luxurious rather than rights. Standing there, surrounded by the beauty of the world's largest mangrove forest, we feel empathy for them. The Sundarbans was not just about biodiversity; it was also about resilience. The people living here are actual survivors, balancing their lives on the thin line between nature's bounty and nature's wrath.

As the sun dipped into the horizon, painting the sky with shade bloody red and orange, we sat quietly on the deck of our boat and replayied the journey's moment. Travel is not always about ticking things off a bucket list; it shows the delicate replayed balance between humans and nature and changes the way we show our life.

Nomads Along the Sea

Fateema Tuz Zahra
Student
Department of Disaster Management and Resilience

My ears recognize the gusts of breeze like kids recognize their school alarm's chime. Arriving like a distant hush beyond the barren fields, an undertone rippling through the strong waves of *Kholpetua*, it begins to claw its way into our lives. Amma says that this breeze has a recollection of its own–it reappears, to gaze upon whatever remains around us.

Our house has bones made out of timber, flimsy ropes tied around its ligaments and skin that is a rusty tin. *"A 'home' like this is functional."* Says Abba. Dadi calls it a misfortune and I say it is a broken promise. As the blue sky turns grey and the radio hanging by our door screeches with storm warnings, Abba unties the knots, opens up the suitcase and folds our whole life into the lifeless tin-box. Sensing the fear in my eyes, he kneels and tells me with a kind voice, *'We must learn to push through before the water pushes itself into our lives. That is how we withstand the deep blue.'*

The lawn around our house smells like the coast, and the pond water tastes like salt now. When Amma would bathe me, she would jokingly say that I would one day grow a crown made of salt crystals. Our village is barren. Showing a grim possibility of farming, the shrimp *ghers* are taking over the paddy plains. At some point in the nightfall, I observe the saline water sneak into everything we own; the lands, the walls, the ponds and our minds. The adult women whisper in a code language I cannot understand: Amma gazes at the dark sky and pleads, *'Let there be enough sweet water to bleed each month free from pain'*.

The red 'cyclone-flag' is hoisted over the Union building, and suddenly the world shifts its pace. Amma puts my school certificates inside the trunk. *'Hold onto papers'*, she says. *'Papers remember us when everyone else forgets.'* Dadi leaves a kiss on our door lock as if preserving a mark of her existence. My glance shifts towards the neighbouring house, Munia Apa, clutching onto her Niqab as the wind tugs at it tenaciously. She insists on not going to the shelter unless her husband can go with her, willing to risk her life rather than having strange stares on her.

Abba, Amma, Dadi, and I walk alongside the entire village, rushing towards the shelter before the storm reaches us. The shelter resembles a large galleon made of brick, stationed on four sturdy pillars. Some days, we have our classes held here, but on days like this, it is our only saviour. The shelter room smells like sweat, damp clothes, and kerosene lamps. Men and women are separated by a mere curtain: thin enough for the piercing gaze of men to pass right through it. The latrines have doors that do not lock; the meanwhile, new mothers struggle to nurse their little ones.

The night unfolds with a sinister laughter. The wind is roaring and crashing around us, as if hungry for our lives; we sit upright at the sound of a glass window shattering at the back. I imagine our house now breaking like a bird's brittle bone caught in the wind, and I ponder the thought of tomorrow, either putting it back together or leaving it to become someone else's story.

Once the storm has come to an end, our village has whirled itself into a new order, a devastation, a disaster. Trees have been uprooted, and huts have turned into dust. Our house has now become a memory engraved on a, muddy land. Amidst all of this, Abba reassures, *'We shall rebuild our life.'* Over the next few days, the men from surrounding unions arrive, bringing with them a possibility to rebuild, as Abba had said. Some say that they have made a list of those in need of relief and a home. But here, the names are scribbled and erased based on relations with the members in authority. I remember Amma's earlier remark, *'Papers remember the forgotten.'* Only this time, I seem to be questioning it.

In the last eight months, fate has forced us to move four times–and with every turn, our house has become more fragile than the previous time. I am now an expert at farewells: I have since learned to fold clothes, home and life, all into one small bag instead of playing with toys. I have installed a mental compass, forever prepared to focus on the next step. My certificates have started to collect dust since school is now a story in itself. At the local tea stall, I lock eyes with the Headmaster. He asks me about home, and before leaving, he hands me a library book to read.

Since then, every day after sunset, I rush towards the *Hariken* lamp and bashfully open the book, taking a deep dive into stories about children with homes and foods, children who go to holidays wearing bright clothes and complain about which toys to buy. Abba fancies leaving the village and moving far north, where seawater cannot reach us and the water doesn't taste salty. They say travelling this far costs a fortune, but at our house, fortune runs dry, and purse grows thinner every day. And so, we remain, souls with no roots; drifters with no place to call our own.

Yet, life carries on, and we rebuild our lives from scratch. Abba lays down the straws for our roof and tightens the timbers with rope. I push my back against our 'home' and dream of a distant future. My dreams resemble a utopia, a strong house made of bricks, cement, and stairs made to climb. I imagine myself riding my pastel blue cycle in our very own backyard. Dadi would always tell me that she wishes to plant a *Tulshi* tree, the same as my name, when we have a home of our own. And so, I preserve her wish in my dreams and imagine the fresh smell of *Tulshi* invading my senses, a cool breath of new beginnings.

I feel the southern wind whisper from ear to ear, arriving with a mischievous grin like it always does. But this time, I smile back and stare at it; not with fear but with courage. I do not know where the next storm will take us, but I know I will climb every mountain and cross every river, and I will do so each time with vigour until I find my eternal home.

Decolonising Education in Bangladesh: Rethinking Curriculum and Knowledge

Zahra Anjum
Student
Department of International Relations

Across Bangladesh, young minds are driven by curiosity and a strong desire to understand the world around them. They seek to question, learn, and contribute meaningfully, hoping to connect their knowledge to both global developments and local realities. Yet, when they open their textbooks, they often find that the perspectives presented are dominated by voices from Europe and North America. Local innovations, regional research, and insights from Bangladeshi scholars or thinkers are rarely acknowledged. In pursuing knowledge, these students are guided largely by frameworks shaped far from their own contexts, filtering their intellectual curiosity through someone else's lens. For many, English is not merely a language–it is treated as a gateway to knowledge, opportunity, and prestige, reinforcing the dominance of distant perspectives over local understanding.

The roots of this phenomenon lie in colonial history. During British rule in the subcontinent, Macaulay's Minute on Education (1835) articulated a vision for education in India that explicitly devalued indigenous knowledge, advocating the teaching of the English language and Western literature as a means to create 'a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect.' Other colonial administrators echoed this approach, establishing schooling systems where Western textbooks dominate syllabi, English-medium instruction is treated as superior, and curricula often present global knowledge through a Western lens. Students are frequently encouraged to memorise theories formulated in Europe or North America, while local thinkers, writers, and scholars remain marginalised. Consequently, Bangladeshi students graduate with a wealth of knowledge about distant societies, but a limited understanding of their own cultural, historical, and social realities. Even decades after independence, the legacy of this system continues, subtly shaping what is taught, how it is taught, and what forms of knowledge are valued.

The challenges of this inherited system are manifold. First, there is an epistemic imbalance: across Bangladesh and much of Asia, English-medium schools are widely regarded as superior, a perception that extends to higher education. English is often conflated with modernity, global competence, and intellectual prestige. While proficiency in English undeniably facilitates access to global scholarship, its overemphasis reinforces systemic inequities. Those with limited access to English-medium instruction are marginalized, and local languages, knowledge systems, and modes of thinking are undervalued. Second, the dominance of Western paradigms in higher education creates intellectual dependency: universities across disciplines–from social sciences and literature to science and technology–prioritise Western frameworks, with textbooks overwhelmingly authored by Western 'white' scholars. This presents Western experiences as universal while silencing indigenous insights and locally rooted scholarship. Finally, the pedagogy itself reinforces colonial legacies: rote memorisation and examination-driven learning continue to dominate, stifling creativity and discouraging students from critical inquiry, cultural grounding, and the imagination of alternative futures.

To address these issues, Bangladesh's education system must be decolonised. It is not simply about replacing English textbooks with Bangla ones or rejecting 'global north' knowledge. Rather, it is a comprehensive rethinking of what constitutes knowledge, whose perspectives are prioritised, and how students engage with the world. It seeks to dismantle the epistemic hierarchy that privileges Western thought and to centre local,

indigenous, and diverse voices. In practical terms, this means integrating locally produced research, histories, literature, and cultural knowledge into curricula, while also critically engaging with global scholarship rather than passively accepting it.

Students, scholars, and governments all have roles to play in this transformation. Students can actively seek out local scholarships, participate in research projects that address domestic challenges, and engage in critical discussions about the relevance of imported theories. Scholars can produce and disseminate knowledge rooted in local contexts, challenge Western-centric narratives, and mentor the next generation of thinkers. Governments and educational institutions can implement policies that incentivise curriculum reform, support Bangla–medium research publications, and facilitate collaborations with other post-colonial societies to share methodologies and perspectives. Together, these efforts create a holistic ecosystem for knowledge production that is both globally informed and locally grounded.

The benefits of decolonising education are profound. A curriculum that values indigenous knowledge alongside global perspectives fosters critical thinking, creativity, and intellectual autonomy. Scholars, students, and professionals trained in a decolonised system are better prepared to challenge inequitable global structures, contribute innovative solutions to pressing problems, and assert and assert Bangladesh's intellectual presence on the world stage of Bangladesh's on the world stage. Conversely, failure to decolonise carries significant risks. Continuing to privilege foreign knowledge while neglecting local insight perpetuates dependency, stifles innovation, and alienates generations of students from their own history and culture. Bangladesh risks producing graduates who are highly literate in global theories yet ill-equipped to address domestic challenges, from governance to climate resilience to social inequality. The epistemic gap between what students are taught and the realities they face grows, weakening the nation's intellectual sovereignty and capacity for self-directed development.

Practical pathways for change already exist. South African universities, for example, have sought to 'Africanise' their curricula by integrating local histories, philosophical traditions, and literature, while Latin American institutions promote decolonial pedagogy that challenges colonial legacies in knowledge production. Bangladesh can adapt these approaches, introducing more Bangla-medium programmes, encouraging student-led research into local issues, and creating spaces where critical debate and reflection are central. Educational reform should also include teacher training that equips instructors to incorporate local knowledge, facilitate critical engagement, and challenge entrenched hierarchies of thought.

Ultimately, decolonising education is not a rejection of global engagement; it is an assertion of intellectual sovereignty. It calls for a generation of students and scholars who can navigate the world with confidence, drawing on both local wisdom and global knowledge. Education in Bangladesh has the potential to be liberatory, not merely instructive. By decolonising curricula, prioritising local voices alongside global perspectives, and fostering critical, independent thought, we can cultivate a generation of thinkers, leaders, and citizens who are deeply rooted in their heritage yet fully equipped for global engagement. Until we reclaim our knowledge and our intellectual agency, we risk remaining students of others' worlds rather than architects of our own.

The Cartographer of Clouds

Mst. Fatema Binta Alam Jim
Student
Department of Economics

Emotions, even when tangled and overwhelming, paint your inner world with raw honesty. Vulnerability carries its quiet grace, and even in the most anxious moments, a strength is being born within you. Here is something soft, unseen, but real.

Sometimes the mind refuses to calm down. The storm inside keeps spinning, and the thoughts whirl as if they will never stop. They do not feel like simple thoughts; they feel like fragments of reality, so vivid you could almost touch them. In that chaos, intuition sharpens until it feels like certainty. You begin to sense what others might be thinking, and it no longer feels like guessing.

How can one not fall in love with a mind like that? It hurts, yes, but it guides. In a world full of noise, your mind quietly becomes your most loyal companion. It's like a silent conversation with yourself, where no one else's words quite make sense.

There's an art to surviving the chaos, a kind of quiet revolution that happens inside of you. Restlessness fills you. The mind doesn't stop, but that only proves you are alive. Your emotions carry every shade, like a moving rainbow, sometimes bright, sometimes heavy. The storm inside begs to be spoken, while outside, you smile at simple things. You may not always know how you are holding yourself together, but you know the one thing you want: peace. Just peace.

Peace is what you crave because it is the only rest in this beautiful chaos called life. The soul feels heavy, the chest feels burdened, yet the eyes keep holding back tears. You may feel like a broken lens, carrying voices inside, uncertain futures, and moments of quiet tears. Some days, you push people away while silently searching for someone safe to lean on.

You may believe your absence would change nothing in this world, yet you continue to breathe. And that itself is proof, there is still something here worth staying for, even within the ache. You might not see it now, but that's proof enough that your place in the world matters.

So, you are not 'too much.' You are alive. You feel deeply, you notice what others ignore, and though it may seem like a burden, it is also your greatest gift. You know the weight of being unseen, unheard. You know the endless equations running through your head. It allows you to see the world as it is, in all its beauty and pain. And yes, it can be overwhelming, but it also teaches you about depth, resilience, and the quiet spaces where healing takes root.

So breathe. Let the heart loosen. You don't need to fix everything right now. It is enough that you are here, feeling, enduring, learning. One day, the storm inside will reveal its purpose. Until then, let it be your teacher, not your enemy.

And perhaps, in the quiet of your thoughts, where the world feels loudest, peace has already been sitting, waiting for you to notice it.

Rising Tides

Azmaine Faeique
Lecturer
Department of Public Administration

Rivers swell beyond familiar banks,
Salt and silt mingle with wooden planks.
Villagers gaze at the rising seas,
While wind and water bend the trees.

Mangroves anchor the trembling shore.
Communities gather, plan, and prepare more.
Storms may rage and skies may pour,
Yet hope endures, steadfast at the core.

Cyclone shelters hum a quiet song.
Stories of courage echo strong.
Children's laughter pierces the rain,
Farmers rebuild, enduring the strain.

Innovation blooms beside flowing tides.
Floating schools, boats as guides.
Nature tests, yet people sway,
Resilience rises, day by day.

Bangladesh stands, whether tide or calm.
Strength in lessons, like a soothing balm.
From every storm, every rising flood,
Life persists through sweat, tears, and mud.

When the Little Stars Fell

Mst. Nusrat Jahan Suchi
Lecturer
Department of Sociology

They left for school with hearts so light,
With dreams to bloom, with eyes so bright.
But fate was cruel; the sky turned grey.
And gentle lives were swept away.

The walls still whisper songs they sang,
The playground waits where laughter rang.
Books lie open, pages bare,
Tiny footsteps are not there.

Mothers weep, and fathers pray.
As silence steals the words away.
The world feels heavy, torn apart,
Yet love still beats in every heart.

But little stars don't fade with night,
They rise to bathe the dark in light.
Beyond the clouds, so pure, so far,
They shine forever as a guiding star.

Though sorrow lingers, hope will stay.
Your memory lights the darkest day.
Little stars, in skies above,
You live in prayers; you live in love.

From Desk to Dais

Ridwana Islam Ruhama
Lecturer
Department of English

Once I sat,
Where they now sit,
Dreaming and doubting,
Bit by bit.
The whiteboards shone.
The voices stayed.
And shaped the dreams
My heart has prayed.

I leaned to catch
Each fleeting phrase,
Each theory's implication,
Each poet's gaze.
From phonemes to syntax
Stanzas to rhyme
They knitted my spirit,
Line by line.

Now I stand.
Where dreams take flight,
Beneath the glow
Of Smart Board's light.
The dais calls
And I tread with care,
To guide the minds
That gathered there.

Their restless minds,
Their questioning eyes,
Recall the girl.
Who sought the skies.
Whether through IPA or
Blake's bright flame,
I find the echo.
Of my name.

Thus, learning flows
An unseen stream,
That wakes the thought,
Rekindles the dream.
Each lecture leaves
Its secret mark,
Inscribing on the soul,
Dismissing the dark.

And when the doubts
Begin to rise,
My heart recalls
The watchful skies
This very role.
A trust, a gift, a sign,
A thread within
The grand design!

So, when their voices
Start to soar,
When timorous hearts
Seek more and more.
I watch them bloom.
My soul at rest,
For in their triumphs,
I am blessed.

The Uniform That Stands

Md Rafidul Islam
Student
Department of Public Administration

When others run, they rise
not for glory, not for gain,
But because the uniform demands
a heart that holds through severe pain.

In flood or fire, in darkest hour,
They move where fear commands retreat.
No trumpet sounds, no garlands shower
just steady boots and blistered feet.

They do not ask for songs or praise,
nor medals cast in fleeting light.
Their honor lives in unseen days,
in silent acts, in sleepless nights.

So, when the world begins to sway,
and safety slips from trembling hands
remember those who chose to stay:
The uniform that still withstands.

A Spark of Magic

Shurovi Akter
Student
Department of Public Administration

Through meadows green where daisies grow,
A butterfly flies softly and slowly.
With wings of velvet, bright and wide,
It paints the air on every glide.

It carries whispers from the breeze.
Through golden fields and towering trees.
Each flutter sings a secret song,
That lifts the weary hearts along.

Its colours sparkle in the sun.
A fleeting jewel, a dream begun.
It dances lightly, here then gone,
A fleeting spark that lingers on.

Where sorrow sits and shadows stay,
The butterfly can chase away.
A touch of wonder, calm and bright,
It fills the soul with gentle light.

A whisper floats on twilight's breeze,
Like silver songs among the trees.
In fleeting glow, the moment stays,
A moment of magic the wind feels.

Oh, fragile friend with wings so true,
You turn the grey skies into blue.
A trace of wonder, soft as a sea,
A spark of magic, pure and slow.

The River's Path from Sunrise to Sunset

Mohammad Fahim Faysal
Student
Department of English

As life begins, we resemble streams, calm and expansive,
Flowing with dreams where laughter & joy are easy here.
The world feels like a playground, full of light and wonder.
We chase butterflies & dance beneath the night sky.

Growing stronger over time, our current picks up speed.
In spring, we are young, bursting with energy we need.
We make friends and memories–like stones on the shore,
Everyone a treasure, and we want more.

As the river turns, we step into life's afternoon.
The current stays steady; now there's a different tune.
We work & strive, building castles in golden sand,
Wishing they stand tall, strong & grand.

When evening rolls in, the river slows down.
The sun sets softly, painting colours around town.
We think about our journey–each twist and each turn,
All the lessons learned and bridges we've had to burn.

Finally, as night falls, the river finds the sea,
A quiet letting go as we set our spirits free.
Life flows on in a circle that never seems to end.
It's a journey through stages–each one a dear friend.

Dear Aphrodite,

Yousha Andalib
Student
Department of International Relations

Summoned by my tears,
with grace and beauty,
stands tall in front of me, dear Aphrodite.

'Why do you weep, child?' she wonders.
'Oh, but it's my heart that is no one's.
Take it, take it,' I say as I wander around.
'Tell me, is there someone ever to be found?'

'The Sun still shines child,
Your time is yet to arrive.'
'But what if I sleep one day,
Never again rise?

Heaven shall grant what earth cannot,
All reside there, sweet and fond.
Oh, but what if heaven denies my soul?
What if a burning pit swallows me whole?

No one to love, no one to hold,
My heart will perish, all on her own.
Tell me, dear goddess,
Does someone yearn for love just as I do?
If yes, then do you lie to them?
or give them what's true?'

'Love is not the same, child, for everyone around.
It comes in its own way and does what is bound.'
'Keep me not in the dark; my mind is frail.
You are no goddess if love is fake!'

'Dare not call it that, child.
It is mightier than your beliefs.'
'I do not believe it, as it hasn't come to me.
Love has failed and so have you.
My heart wails, and there's nothing you can do.'

Stunned by my words,
silent and mighty,
fades away abashed,
Dear Aphrodite.

The Green Horizon of BUP

Asib Al Arafat
Student
Department of Public Administration

BUP appears not as buildings of stone,
but a horizon painted with living green.
Each tree stands like a sage,
established on patience, stretching out to hope.
The campus breathes in a rhythm,
a stillness abuzz with the hum of futures unfolding.
Our dress code is not a rule,
but a woven fabric of respect and identity.
Discipline is soft but firm here,
shaping us gently as the wind shapes the course of the river.
There is not just freshness in the air,
but in the courage of young voices and the very act of speaking out.
Knowledge piles up like light,
falling upon all who seek equally.
Diverse paths, a single goal,
a symphony of purpose progressing towards a shared dawn.
In this horizon, green is hue alone no more,
but hope of life and growth and belonging.

কীভাবে সুখী হওয়া যায়?

মেজর শামীম সাখাওয়াত
কর্ড টু প্রো-ভিসি
প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের অফিস

প্রথমত সুখ জিনিসটা হলো আপেক্ষিক। তাছাড়া সুখ হলো ক্ষণস্থায়ী এবং তরল পদার্থ বা পানির মতো। সুখের নির্দিষ্ট কোনো রূপ নেই। সুখ একটি অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি। সুখ যেহেতু ব্যক্তিগত অনুভূতি তাই এটি আপেক্ষিক। সময়, পরিবেশ, স্থান, কাল, পাত্র (ব্যক্তি) ভেদে সুখ পরিবর্তিত হয়। যেমন, কোনো এক ব্যক্তির নিকট আইসক্রিম বা চকলেট যেমন আনন্দ প্রদান করে তেমনি একজন ডাইয়াবেটিকস বা দাঁতের সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঐ একই আইসক্রিম অনুরূপ সুখ প্রদান করে না। আবার কোনো ছোট বাচ্চার (৭-১০ বছর) নিকট সাইকেল যতটা সুখী হওয়ার অনুভূতি প্রদান করে, কিশোর/যুবকের নিকট একই সাইকেল একইরকম সুখ প্রদান করতে নাও পারে। আবার কিশোর বা যুবকের নিকট মোটরসাইকেল যতটা সুখ বয়ে আনে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের কাছে মোটরসাইকেলে সম্ভাব্য দুর্ঘটনার কথা বিবেচনা করে ততটা সুখ বয়ে আনে না। আবার প্রাপ্তবয়স্ক লোকের কাছে গাড়ি যতটা আনন্দ দেয়, কিন্তু পূর্ণবয়স্ক লোকের কাছে মোটরগাড়ি বা সাইকেল ওভাবে সুখ বয়ে আনে না। ধরুন, কোনো ব্যক্তির বাবা-মা যদি বেঁচে থাকার পরও তার বাবা-মায়ের সাথে সম্পর্ক ভালো না থাকে, তারপর স্ত্রী-সন্তানদের সাথেও সুসম্পর্ক না থাকে, আর তার যদি কোনো বিশ্বস্ত বা ভালো বন্ধু না থাকে, তবে সেই ব্যক্তির নিকট অঢেল সম্পদ-সম্পত্তি পুরোটাই অর্থহীন হয়ে ওঠে। অর্থাৎ মানুষের জীবনে টাকার থেকে তার বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকাটাই সুখের ও আনন্দের বিষয়।

তাহলে সুখী কে?

আমি অনেক মানুষকে জিজ্ঞাসা করেছি - তিনি সুখী কি না? আশ্চর্যের বিষয়, এর প্রত্যুত্তরে কয়েক রকম উত্তর পেয়েছি। কিছু মানুষকে উপরে উপরে সুখী দেখা গেলেও আপেক্ষিকভাবে তিনি সুখী নন। আবার অনেকে উপরে উপরে অসুখী দেখালেও আপেক্ষিক দৃষ্টিতে তিনি সুখী। কারও কারও কাছে জীবনের উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ চাকুরি, ব্যবসায়ে সফলতা, উচ্চতর শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থান, প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত অর্থ জীবনকে সুখী করার জন্য অন্যতম উপাদান। কিন্তু দীর্ঘদিন উচ্চপদস্থ চাকুরি করার পরে যদি কোনো ব্যক্তিকে হঠাৎ চাকুরিচ্যুত হয়ে পারিপার্শ্বিক কারণেই তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়, তাহলে সেই উচ্চপদস্থ চাকুরি কখনই চিরস্থায়ী সুখের কারণ হতে পারে না। এখানে উল্লেখ্য যে, উচ্চপদস্থ চাকুরি করার পাশাপাশি আমাদের নিজেদেরকে এমনভাবে সংযত রাখতে হবে যে, পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনে যেন তাকে দেশত্যাগে বাধ্য হতে না হয়। সহজ ভাষায় বলা যায়, সুখী হওয়া উচিত তারই, যে ব্যক্তির সাথে তার বাবা-মায়ের সুসম্পর্ক রয়েছে এবং তার উপর বাবা-মায়ের আদর, ভালোবাসা ও আশীর্বাদ রয়েছে; আবার একই সাথে তার স্ত্রী-সন্তানদের সাথে সুসম্পর্ক ও আস্থা রয়েছে। যে দম্পতির মধ্যে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস আর ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ়, যার সন্তান সুশিক্ষায় শিক্ষিত, আদব-কায়দায় মার্জিত, যার সাথে তার আত্মীয়দের সুসম্পর্ক রয়েছে এবং যার বিশ্বস্ত ও নিঃস্বার্থ বন্ধু রয়েছে, সে ব্যক্তি নিজেকে সুখী হিসেবে দাবি করতে পারে। অপরদিকে, যে ব্যক্তি তার প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের যোগান দিতে পারে অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তির যদি ১০,০০০ টাকা চাহিদা হয়ে থাকে এবং সেই ব্যক্তি ১০,০০০ টাকা যোগান দিতে সক্ষম হয়, তাহলে তারও সুখী হওয়া উচিত।

মূল কথা হলো, সুখী হওয়ার অন্যতম উপাদান হলো সুস্বাস্থ্য। কোনো ব্যক্তি যদি শারীরিকভাবে সুস্থ হয় অর্থাৎ সে দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি কঠোর পরিশ্রম করতে সক্ষম হয়, তাহলে তার সর্বপ্রথম সুখী হওয়া উচিত। এর পরেও অনেকে অসুখী - যা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কেন? অল্পতে সন্তুষ্টি হওয়া উচিত না, কিন্তু খুশি হওয়া উচিত। আর আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আমার মতে, খুশি ও সুখী হওয়া দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। ব্যাপারটা একটু বিশ্লেষণ করি। ধরুন কোনো ব্যক্তি ২৪ বছর বয়সে তার পড়াশুনা শেষ করেছে এবং সে তার বাবার হোটেলে বসে বসে খাচ্ছে অর্থাৎ সে বেকার। এখন সে বলে বেড়াচ্ছে যে, আমি

চাকুরি বা ব্যবসা কোনটাই করবো না; আল্লাহ যা দিয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট বা সুখী। এই চিন্তা-ভাবনা কি ঠিক হলো? স্বভাবতই না, মোটেও ঠিক হয়নি। কেননা সন্তুষ্ট হওয়া আর খুশি হওয়া দুইটি আলাদা জিনিস। তাহলে দাড়াচ্ছে যে, আমাদের জীবনে খুশি হতে হবে কিন্তু সন্তুষ্ট হওয়া যাবে না। কেননা আমাদের জীবনে উন্নয়নের জন্য অসন্তুষ্ট থাকা উচিত বা প্রয়োজন। জীবনকে পরিবর্তন করার জন্য অসন্তুষ্ট বা ক্ষুধা থাকতে হবে। হ্যাঁ, বিষয়টি একটু অদ্ভুত। অসন্তুষ্টি আমাদের জীবনের মান উন্নয়ন, পরিবেশ পরিস্থিতি উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়ন করতে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। তবে প্রতিটি মুহূর্তে আমরা যতটুকু অর্জন করেছি তার জন্য আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করতে হবে এবং আরো উন্নত জীবনের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ১০ বছরের শিশু ক্লাস ফোরে পড়া শেষ করেছে এবং ফোর পাস করে ফাইভে উঠেছে। এখন যদি সে নিজেকে বলে আমি ফোর পাস করছি। আমি এতেই সন্তুষ্ট আমার ফাইভ পাস করার দরকার নেই। এরকম চিন্তা করলে, সে কখনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করতে পারবে না এবং বিষয়টি খুবই বোকামি। তাহলে আমাদের কি করা উচিত? আমাদের উচিত ক্লাস ফোর-এ যখন পড়ব তখন ফোর পাশ করা এবং ক্লাস ফাইভ-এ ভর্তি হওয়া। একইরকম ভাবে প্রতিটি ক্লাসে ভর্তি হওয়ার পরে সেই ক্লাসের পড়াশুনা শেষ করা। এর পাশাপাশি যার যতটুকু সামর্থ্য আছে সে অনুযায়ী ভালো ফলাফল করার চেষ্টা করা এবং পরবর্তী ক্লাসে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়া। অনুরূপভাবে, পড়াশুনা শেষ করে যদি চাকুরি বা ব্যবসা শুরু করে, তখন নিজের যোগ্যতা ও পরিশ্রম করে চাকুরিস্থলে পরবর্তী পদোন্নতির জন্য নিজেকে তৈরি করা এবং একই সাথে নিজের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করা। অথবা, পড়াশোনার পর তাকে ব্যবসার ক্ষেত্রেও নিজের সামর্থ্য ও পরিশ্রম দিয়ে ব্যবসার ক্রমাগত উন্নতির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। সুতরাং, নিজের বর্তমান অবস্থার জন্য খুশি হয়ে (সুখী না হয়ে) পরবর্তী উন্নয়নের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার মাধ্যমে সাময়িক সন্তুষ্টি লাভ করা উচিত। সাময়িক সন্তুষ্টি হলো কখনো শেষ না হওয়ার একটি প্রক্রিয়া, সন্তুষ্টির শুরু আছে কিন্তু এর কোনো পরিসীমা বা সীমানা বা সর্বশেষ রেখা বা পূর্ণতা নেই। উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছানোর জন্য সর্বদা চেষ্টা করে যাওয়াটাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

তাহলে সুখী হওয়ার শর্তাবলি কি?

- **শর্ত-১।** নিজেকে সর্বদা সুস্থ রাখা এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া। নিজ সৃষ্টিকর্তার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা।
- **শর্ত-২।** নিজের পারিবারিক সদস্য এবং সামাজিক সদস্যের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। পারিবারিক সম্পর্কের যত্ন নেয়া ও সহানুভূতিশীল হওয়া।
- **শর্ত-৩।** ঘনিষ্ট কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব রাখা।
- **শর্ত-৪।** নিজের বর্তমান অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্টি থাকা এবং সৃষ্টিকর্তার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। পাশাপাশি, পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা।
- **শর্ত-৫।** আত্মোন্নয়নের জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

এবার দেখা যাক ইসলামি/ধর্মীয় দিক থেকে সুখ কি?

"স্বাস্থ্যের চাইতে বড় সম্পদ এবং অল্পে তুষ্টির চাইতে বড় সুখ আর কিছু নেই" হযরত আলী (র:)। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আনা বা ইমান, সালাত, রোজা, যাকাত এবং হজ্ব। এখানে একটি বিষয় খেয়াল করতে হবে, আমার উপর সালাত ও রোজা কোন অবস্থায় ফরয হয়। যদি আমি অসুস্থ হই তখন আমার উপর সালাত ও রোজা ফরয না। তাহলে সালাত আদায় ও রোজা রাখার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সুস্থ থাকতে হবে। কেবল তখনই আমার জন্য সালাত ও রোজা ফরয হচ্ছে। তাই নিজ ধর্ম পালনের জন্যও অবশ্যই আমাদেরকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে এবং নিজ নিজ ধর্মের আদেশ-নিষেধ পালন করতে হবে। আবার সুস্বাস্থ্যের বিভিন্ন স্তর রয়েছে, যেমন ধরুন একজন মাত্র তিন বা চার তলা সিড়ি দিয়ে উঠতেই হাঁপিয়ে যায়, আবার একজন ম্যারাথন দৌড়বিদ টানা ৪৫ কি:মি: দৌড়াচ্ছে, আবার একজন বডি বিল্ডার অনায়াসে ৭০/৮০ কিলোগ্রাম ভার উত্তোলন করেছে। তাই আমাদের ক্রমাগত সুস্বাস্থ্যের উচু স্তরে যেতে হবে। এ থেকে বলতে পারা যায় যে, সুখী হওয়ার অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে সুস্বাস্থ্য।

নামাজ ও রোজার পাশাপাশি আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী যাকাত দেয়া ফরয। যাকাত প্রদান করার জন্য আপনাকে অর্থ উপার্জন করতে হবে। আর অর্থ উপার্জন করতে আপনাকে সুস্থ হতে হবে। এছাড়াও যাকাতের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে নিকটস্থ আত্মীয়দের মধ্যে গরীব ও অসুস্থ আত্মীয়রা অগ্রগণ্য। আর যাকাত দেয়ার ফলে আত্মীয়দের মধ্যে সম্পর্ক আরো উন্নতি হয়। আর এজন্য বলতে পারি যে, সুখী হওয়ার অন্যতম উপাদান হচ্ছে সুস্বাস্থ্য ও পারিবারিক সুসম্পর্ক।

অপরদিকে, সুখ মানে কি ভবিষ্যতের জন্য কোনো আশা বা আকাঙ্ক্ষা? মানুষের জীবনে সর্বোচ্চ চাওয়া হলো মৃত্যুর পরে পরকালে জান্নাত লাভ করা। কিন্তু আমাদের কেউ যদি বলে মৃত্যুর পরে কিছু নাই। মৃত্যুই আমাদের সবকিছুর অবসান। তাহলে আমাদের জীবন থেকে সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কেড়ে নেওয়া হবে। যা কখনোই বাস্তবে সম্ভব নয়। তাই জীবনের সুখী হওয়ার জন্য আশা বা আকাঙ্ক্ষা প্রয়োজন। আর এর পূর্বে আমাদের যা আছে তাতেই খুশি বা তুষ্ট থাকা উচিত এবং এর সাথে পরবর্তী সময়ের উন্নত জীবনের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা উচিত। উন্নত জীবনের জন্য পরবর্তীতে লক্ষ্য বা আশা আমাদেরকে কষ্ট করতে শেখায়, আরামকে ত্যাগ করে পরিশ্রম করতে শেখায় এবং মনের পছন্দের বিষয়কে সাময়িক ত্যাগ করতে শেখায়। ধরে নিচ্ছি, আপনি বর্তমানে A পয়েন্টে অবস্থান করছেন। এখানে আপনি খুশি হতেও পারেন বা না ও হতে পারেন। আপনি পয়েন্ট A হতে B তে যেতে চাচ্ছেন। আর আপনি মনে করছেন B-তে পৌঁছালে সুখী হবেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে আপনি পয়েন্ট B-তে বেশিদিন সুখী থাকতে পারবেন না। কেননা এরপর পয়েন্ট C ও D আছে এবং এভাবে আপনার মৃত্যু পর্যন্ত পয়েন্ট Z আছে। এখানে পয়েন্ট Z-কে মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, পয়েন্ট A থেকে পয়েন্ট B-তে পৌঁছানোর রাস্তা বা যাত্রাপথেও খুশি ও সাময়িক সন্তুষ্ট হওয়া সম্ভব। তবে সুখকে প্রাপ্তির ফলাফল না করে ত্যাগকেও সুখে রূপান্তর করা যেতে পারে। অর্থাৎ কোনো বস্তু প্রাপ্তির পাশাপাশি কোনো কিছুর ত্যাগেও সুখ অন্তর্নিহিত আছে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ছোট বাচ্চা নতুন খেলনা পাওয়ার পর যে তৃপ্তি বা খুশি অনুভব করে; তার কাছে শুধু প্রাপ্তিতেই সুখ। কেননা যদি তার কাছ থেকে খেলনা কিছুক্ষণের জন্য নিয়ে নেওয়া হয়, তখন সে অঝোরে কান্নায় ভেঙে পড়ে অর্থাৎ দুঃখী হয়ে যায়। আবার কোনো ভিক্ষুককে কষ্টার্জিত অর্থ প্রদানের মাধ্যমেও অন্যকে কোনো সম্পদ বা অর্থ উপহারের মাধ্যমেও আমরা সুখী হয়ে থাকি। তাহলে দেখা যায়, প্রাপ্তির পাশাপাশি কোনো বস্তু বা অর্থ ত্যাগের মাধ্যমেও সাময়িক সন্তুষ্টি বা খুশি হওয়া যায়। বিষয়টি নিচে ছকের মাধ্যমে দেয়া হলো:

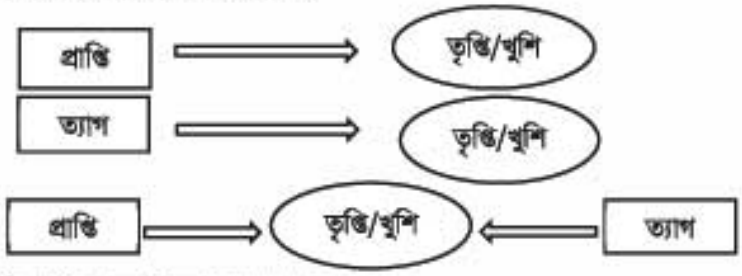

নিম্নে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রাপ্তির পয়েন্টগুলো দেখানো হলো:

(জন্ম) A----(যাত্রাপথ)------B-----(যাত্রাপথ)-----C------(যাত্রাপথ)---------D
E----------F----------G----------H
I----------J----------K----------L
M----------N----------O----------P
Q----------R----------S----------T
U----------V----------W----------X
Y----------Z (মৃত্যু) (জান্নাত/চরম প্রাপ্তি) (জাহান্নাম/সর্বোচ্চ শাস্তি)

পূর্বের কথায় ফেরত যাই, আমাদের যাত্রাপথেও সাময়িক সন্তুষ্টি বা খুশি হওয়া উচিত। কিন্তু কীভাবে? আমাদের মধ্যে দুইটি অস্তিত্ব বিদ্যমান। একটি খুশি বা আনন্দ ও অপরটি দুঃখ/অসুখ। যদি খুশিকে সিংহের সাথে এবং দুঃখ/অসুখকে শিয়ালের সাথে তুলনা করি তাহলে একটি গল্পের মাধ্যমে আমরা বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারব। ধরুন, সিংহকে দীর্ঘ ০৩ মাস যাবৎ তার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট অল্প পরিমাণে খাওয়ানো হলো। ফলে, সিংহ শক্তিশালী প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও টানা ৩ মাস ক্ষুধার্ত থাকায় ও পর্যাপ্ত খাবার না পাওয়ায় এখন সে খুবই দুর্বল হয়ে যাবে। আবার শিয়ালকে প্রতিনিয়ত পর্যাপ্ত খাবার ও সেবা করা হলে শিয়াল বর্তমানে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠবে। বর্তমানে তাদের মধ্যে লড়াই হলে দেখা যাবে শিয়ালের জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

এই গল্প থেকে বোঝা যায় যে, ছোট ছোট অপ্রাপ্তি আমাদের জীবনকে ক্রমশ অসুখী করে তোলে। অপরদিকে, আমরা যদি প্রতি পয়েন্টে যাত্রার কালে ছোট প্রাপ্তি, খুশিতে সন্তুষ্ট হতে থাকি তাহলে এক পর্যায়ে পয়েন্টে পৌঁছানোর পূর্বে তৃপ্তি অনুভব করতে পারব। অর্থাৎ, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোতে খুশি না হয়ে, লক্ষ্যে পৌঁছানোর যাত্রাপথেও ছোট ছোট প্রাপ্তির মাধ্যমে তৃপ্তি লাভ করা সম্ভব।

উপরে উল্লিখিত সকল উপাদানসমূহের মধ্যে একটি বা একাধিক উপাদানসমূহের মিশ্রণে জীবনে খুশি অর্জন বা সাময়িক তৃপ্তি লাভ করা সম্ভব।

অনিন্দ্যসুন্দর দ্বীপদেশে স্বপ্নময় পাঁচ দিন

মোছাঃ দিলশাদ শারমিন চৌধুরী
সহকারী পরিচালক
অফিস অব দ্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স

ভারত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত মালদ্বীপ পৃথিবীর অন্যতম ছোট অথচ বিস্ময়কর দ্বীপরাষ্ট্র। প্রায় ১,১৯২টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই দেশটি ২৬টি এটল বা দ্বীপমালার সমন্বয়ে তৈরি। এর মধ্যে মাত্র প্রায় ২০০টির মতো দ্বীপে মানুষ বসবাস করে, আর অনেকগুলো দ্বীপই শুধুমাত্র পর্যটন রিসোর্টের জন্য ব্যবহৃত হয়।[১]

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, মালদ্বীপ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে। এখানে একসময় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত ছিল, তবে ১২ শতকে ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে দেশটি সম্পূর্ণ মুসলিম রাষ্ট্রে রূপ নেয়। বর্তমানে এটি বিশ্বের অন্যতম ক্ষুদ্রতম মুসলিম দেশ, তবে পর্যটন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে বিশ্বজুড়ে এর পরিচিতি ব্যাপক।[২]

মালদ্বীপের মূল আকর্ষণ হচ্ছে এর নীলাভ সাগর, সাদা বালুকাবেলা, পানির উপর ভাসমান রিসোর্ট আর সমুদ্রের জীববৈচিত্র্য। 'Tropical Paradise' হিসেবে পরিচিত এই দেশ প্রতি বছর লাখ লাখ ভ্রমণপিপাসুকে টেনে আনে।[৩]

মালদ্বীপ ছিল আমাদের বাকেট লিস্টে শীর্ষে থাকা দেশ। বহুদিন আগেই এর জন্য পরিকল্পনা করেছিলাম, আর অবশেষে ২০২৪ সালের অক্টোবরে আমরা টিকিট কেটে ফেলি। সেসময়ই টিকিট কেনার কারণে আমাদের খরচ তুলনামূলক কম হয়েছিল। অবশেষে ডিসেম্বর ২০২৪-এ আল্লাহ আমাদের সেই স্বপ্নপূরণের সুযোগ করে দেন।

বিমানে বসেই মনে হচ্ছিল, স্বপ্নের খুব কাছে চলে এসেছি। তবে নেমে যাওয়ার মুহূর্তে মাথায় হালকা এক অজানা দুশ্চিন্তা ঘুরছিল। জানালার বাইরে তাকালে শুধু পানি আর পানি – মনে হচ্ছিল আমরা বুঝি এক গভীর সমুদ্রের মাঝখানে ভাসছি। কোথায় নামব আমরা? আশেপাশে কোনো জমি বা দ্বীপের ছায়া পর্যন্ত ধরা দিচ্ছিল না।

চিত্র : পাখির চোখে মালদ্বীপ

বিমান ধীরে ধীরে নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যপট বদলাতে শুরু করল। বিশাল নীলাভ সাগরের মাঝখান থেকে হঠাৎ একে একে চোখে পড়ল ছোট ছোট সবুজ দ্বীপ। মনে হচ্ছিল, যেন স্বপ্নের রঙিন ক্যানভাসে আঁকা টুকরো টুকরো স্বর্গ দেখতে পাচ্ছি।

মাফুশি দ্বীপের পথে

আমাদের যাত্রা শুরু হলো মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে অবস্থিত ভেলানা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে অবতরণের মাধ্যমে। আকাশ থেকে নামতে নামতে যেভাবে ছোট ছোট দ্বীপ চোখে পড়ছিল, সেভাবেই ভেতরে বাড়ছিল উত্তেজনা। তবে বিমান বন্দরে নেমে এক বোতল পানি কিনতে গিয়ে বুঝতে পারলাম সবকিছুর দাম আকাশছোঁয়া, এমনকি কিছু জিনিসের দাম ইউরোপের থেকে বেশি বৈ কম না। শুকনো খাবার সাথে না নিয়ে আসার আফসোসটা তখন সত্যিই বেড়ে গেল। যাই হোক, বিমান থেকে নেমেই আমরা ছুটলাম আমাদের পরবর্তী এবং প্রধান গন্তব্য মাফুশি আইল্যান্ড-এর দিকে ।

এয়ারপোর্ট থেকে মাফুশির উদ্দেশ্যে আমরা রওনা দিলাম স্পিডবোটে করে। সত্যি বলতে কী, স্পিডবোটের যাত্রা নিয়ে আমার মনে প্রচণ্ড ঝাঁকুনির আশঙ্কায় খানিকটা ভয় কাজ করছিল। মূলত চিন্তা ছিল আমাদের পাঁচ বছরের মেয়ে মারিয়াম-এর জন্য সাড়ে চার ঘন্টার লম্বা ফ্লাইট থেকে নেমেই ও কি এই যাত্রা সহ্য করতে পারবে? কিন্তু এই দেশের স্পিডবোটগুলো আমাদের দেশের থেকে কিছুটা ভিন্ন, অনেক বড় আর প্রশস্ত, সেইসাথে সমুদ্র অনেকটা শান্ত থাকায় ঝাকুনি ছিল অনেক কম। আমাদের মেয়ে দেখলাম ভয় তো পাচ্ছেই না, উলটো অনেক বেশি মজা পাচ্ছিল, আলহামদুলিল্লাহ। শান্ত সমুদ্র আর হালকা বাতাসে ভেসে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল, ভয় নয়, বরং এ-এক আনন্দের সফর।

মাফুশিতে পা রাখতেই বুকিং করা হোটেলের অটো এসে আমাদের রিসিভ করল। ছোট্ট দ্বীপ মাফুশি–তবে প্রথম মুহূর্তেই তার প্রাণচাঞ্চল্য অনুভব করলাম। এখানে আমাদের থাকার অভিজ্ঞতাও ছিল আলাদা; আমরা দুইটি হোটেলে থেকেছি, কারণ চেয়েছিলাম দু'ধরনের অভিজ্ঞতা নিতে। এক হোটেলের ব্যালকনিতে বসে ভোরের সূর্যোদয়, আর অন্য হোটেল থেকে সমুদ্রপাড়ে বসে সূর্যাস্ত উপভোগ করা সম্ভব ছিল।

চিত্র : মাফুশির বালুকাবেলায় সূর্যোদয়-এর একাংশ

বিকেলের দিকে আমরা শুরু করলাম মাফুশি ঘুরে দেখা। দ্বীপটি ছোট হলেও এখানে মানুষের উপস্থিতি বেশ প্রাণবন্ত। মালদ্বীপের অনেক দ্বীপের তুলনায় মাফুশিতে জনসংখ্যা বেশি, আর তার মধ্যেও সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো–এখানে প্রচুর বাংলাদেশি আছেন। এখানে কর্মরত বাংলাদেশিদের ভাষ্য অনুযায়ী, মালদ্বীপের মোট আন্তর্জাতিক কর্মীর প্রায় ৫০-৬০% বাংলাদেশি, বিশেষ করে রিসোর্টগুলোর প্রায় সব সেক্টরেই তারা কাজ করছেন।

যদিও বাঙালি দেখলেই কথা বলতে বা নিজের পরিচয় দেওয়ার ব্যাপারে তাদের মাঝে তেমন আগ্রহ দেখি নাই। তাদের গায়ের রং, চুলের স্টাইল আর পোশাকের ধরন কিছুটা তামিলের অধিবাসীদের মতো। স্থানীয় মুসলিম মহিলারা অধিকাংশই বোরকা জাতীয় পোশাক পরে। তবে মুসলিম কমিউনিটি হিসেবে তাদের জীবনযাত্রা আপনাকে মুগ্ধ করবে।

মাফুশিতে থাকার চারটি দিনই আমাদের কাছে ছিল বিশেষ। প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর দেখতাম বোরকা পরা মেয়েরা মোটরসাইকেলে করে ছোট ছোট বাচ্চাদের খেলতে নিয়ে যাচ্ছে। ওদের খেলার জায়গাগুলোও ছিল খুবই চমৎকার, যেখানে একইসাথে খেলার এবং শারীরিক কসরতের বিভিন্ন সরঞ্জাম রয়েছে। মজার বিষয় হলো, এমন উন্মুক্ত জায়গায় করা এসব স্থানে অনেক সরঞ্জাম অনেক পুরোনো হয়ে গেলেও হারিয়ে যায়নি কিছুই, যেটা আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে অবাক হওয়ার মতোই বিষয়।

স্নোরকেলিং-এর ভয় আর বিস্ময়

পরদিন আমাদের প্যাকেজের অংশ ছিল ডে-লং ট্যুর যেখানে স্নোরকেলিং, স্যান্ড বিচে লাঞ্চ আর বোটে করে সমুদ্রভ্রমণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমার জন্য সেটাই হয়ে উঠল ভ্রমণের সবচেয়ে ভয়ংকর অথচ স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

সত্যি বলতে কী, স্নোরকেলিং নামের জিনিসটা আমি কখনো ভালোভাবে বুঝতেই পারিনি। আমি সাঁতার জানি না, আর সেই কারণেই ভ্রমণে কোথাও গেলে সুইমিং পুলেও খুব একটা নামি না; মনে হয় যদি হঠাৎ ডুবে যাই! সেই ভয় নিয়েই নৌকা থেকে নামলাম, কিন্তু কে জানত, এদিন আমার জীবনের ভিন্ন এক অধ্যায় শুরু হবে।
আমার স্বামী আর আমাদের ট্যুর টিমের একজন যেন প্রায় জোর করেই আমাকে সাগরে নামিয়ে দিলো। মুহূর্তের মধ্যে মাথা পানির নিচে নামতেই মনে হলো – এই বুঝি হৃদস্পন্দন থেমে যাবে, এই বুঝি শেষ! কিন্তু পরপর কয়েকবার চেষ্টা করার পর অবশেষে আমি ১০-১৫ সেকেন্ডের মতো পানির নিচে চোখ খুলে থাকতে পারলাম।

আর সেই কয়েক সেকেন্ডই বদলে দিলো আমার ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার পুরো মানচিত্র।
সুবহানআল্লাহ! মনে হচ্ছিল, এ-এক অন্য জগত। স্বচ্ছ পানির নিচে রং-বেরঙের মাছের সারি, নীলাভ প্রবাল আর আলো-ছায়ার খেলা-যেন কোনো শিল্পীর তুলির আঁচড়ে আঁকা এক অপার্থিব ছবি। সমুদ্রের তলদেশের সৌন্দর্যের সেই বিস্ময় থেকে এখনো ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারি নাই।
সত্যিই, সেই কয়েক মুহূর্ত আমাকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে সৃষ্টিকর্তার অসীম ক্ষমতা আর রহমতের কথা, সূরা আর-রাহমানের সেই লাইন : 'অতএব, তোমরা জ্বিন ও মানুষ তোমাদের রবের কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?'

স্যান্ড বিচের অদ্ভুত সৌন্দর্য

ডে-লং ট্রিপের আরেকটি অনন্য অভিজ্ঞতা ছিল স্যান্ড বিচ। ট্যুর টিমের পরিকল্পনা অনুযায়ী দুপুরের খাবার খাওয়ার কথা ছিল সেখানেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেদিন স্যান্ড বিচে প্রায় হাঁটু পরিমাণ পানি জমে ছিল।
তবুও, সেই স্যান্ড বিচে নামার পর আমার মনে হলো–এ-এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। চারদিকে শুধু অথই সমুদ্র, আর মাঝখানে ছোট্ট খালি বালুকাবেলা। স্বচ্ছ নীল পানির ঢেউ এসে যখন চারপাশে ভিজিয়ে দিচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আমি যেন প্রকৃতির এক স্বর্গীয় মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছি।

আরও বিস্ময়কর ছিল পানির রঙের খেলা। একদিকে ছিল হালকা সবুজাভ-নীল, আরেকদিকে গাঢ় নীল জলরাশি–দুটি রং একসাথে মিলেমিশে তৈরি করেছিল এক অপূর্ব দৃশ্য।

প্রাইভেট আইল্যান্ডে একদিন

মালদ্বীপ ভ্রমণের পরিকল্পনা আর অগ্রিম বুকিংয়ের সময় থেকেই আমাদের ইচ্ছে ছিল অন্তত একরাত প্রাইভেট আইল্যান্ডে কাটানোর। যদিও এসব দ্বীপে থাকা সত্যিই অনেক ব্যয়বহুল, তবুও সৌভাগ্যক্রমে আমরা একটি বিশেষ অফারে এক রাতের জন্য বুকিং করতে পেরেছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে জানা গেল, দ্বীপে তাদের নিজস্ব পরিবহন ব্যবহার করতে হবে, যার খরচ ছিল বেশ চড়া। তাই শেষমেশ রাত কাটানোর পরিকল্পনা বাদ দিয়ে কেবল ডে-ট্রিপের সিদ্ধান্ত নিলাম।

যদিও একরাত থাকা হয়নি, তবুও স্বীকার করতে হবে, মালদ্বীপ ভ্রমণের সবচেয়ে সুন্দর দিনটি কেটেছিল এই প্রাইভেট আইল্যান্ডেই।

সমুদ্রের বুকে সারি সারি কাঠের কটেজ, বাঁকানো কাঠের রাস্তার ধারে সাজানো ছোট ছোট ওয়াটার ভিলা–দূর থেকে দেখতেই মনে হচ্ছিল যেন স্বপ্নের কোনো রাজ্যে ঢুকে পড়েছি। ভেতরে ঢোকার ইচ্ছে হচ্ছিল বারবার। অবশেষে সেখানকার দায়িত্বে থাকা

একজনের অনুমতিতে ফাঁকা একটি কটেজে প্রবেশ করতে পারলাম। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখলাম, নিচেই নীলাভ সমুদ্রে ঢেউ খেলছে–যেন সমুদ্র এসে আপনার দুয়ারে কড়া নাড়ছে। সেই মুহূর্তের অনুভূতি সত্যিই ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।

প্রাইভেট আইল্যান্ডে মূলত দুধরনের কটেজ থাকে–ওয়াটার ভিলা ও বিচ ভিলা। ওয়াটার ভিলা সমুদ্রের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে, আর বিচ ভিলা ঘেরা থাকে সবুজ গাছপালা দিয়ে, পাশে থাকে নির্জন সমুদ্রতট। দুটি ভিলার মধ্যেই আছে নিজস্ব অনন্য সৌন্দর্য ও শান্তির আবহ।

চিত্র : প্রাইভেট আইল্যান্ড-এর ওয়াটার ভিলা ও বিচ ভিলার একাংশ

সত্যি কথা হলো, প্রাইভেট আইল্যান্ডগুলোর সৌন্দর্যের সঠিক বর্ণনা দেওয়া আমার মতো সাধারণ ভ্রমণকারীর পক্ষে সম্ভব নয়। জায়গাগুলো এতটাই স্বর্গীয় যে আমাদের ক্যামেরায় ধরা ছবিগুলোতেও সেই সৌন্দর্যের অর্ধেকও ফুটে ওঠেনি। বাস্তবে যা চোখে দেখেছি, তা যে কতগুণ বেশি মনোমুগ্ধকর – সেটা কেবল অনুভব করার বিষয়।

আমরা মালদ্বীপে ছিলাম মোট পাঁচ দিন। এর মধ্যে চার দিন কাটিয়েছি মাফুশি আইল্যান্ডে আর শেষ দিনটি মালে সিটি ও হুলহুমালে ঘুরে। আসলে শেষমুহূর্তে যেন ফ্লাইট ধরতে কোনো অসুবিধা না হয়, সেই ভেবেই এভাবে আমাদের ভ্রমণ পরিকল্পনা সাজিয়েছিলাম।

আজও মাঝেমধ্যে ঘুমের ভেতর চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই সমুদ্রের তলদেশের রঙিন জগত, মাছদের সারি, প্রবালের অপার সৌন্দর্য আর নীলাভ পানির ভেতর সেই বিস্ময়কর মুহূর্তগুলো। মনে হয়, আহা! যদি এমন ভ্রমণের কখনো শেষ না হতো! এই ব্যস্ত জীবনে একটু বিরতি, একটু ভ্রমণ আমাদের কতটা নতুন করে গুছিয়ে নিতে সাহায্য করে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মনে হয় প্রাণটা যেন আবার নতুন করে ভরে ওঠে। তাই আমি বিশ্বাস করি, এই ব্যস্ত সময়ের মাঝেও সম্ভব হলে কাছাকাছি কোথাও হলেও একটু বেরিয়ে আসা উচিত। কারণ ছোট্ট একটা সফরও আমাদের জীবনে এনে দিতে পারে অসাধারণ প্রেরণা আর নতুন উদ্যমে শুরু করার শক্তি।

রেফারেন্স :

[১] Maldives Official Tourism Website (Visit Maldives – https://visitmaldives.com)
[২] Britannica – Maldives (https://www.britannica.com/place/Maldives)
[৩] Wikipedia – Maldives (https://en.wikipedia.org/wiki/Maldives)

একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের ডায়েরির অংশবিশেষ

এ. এস. এম. সাদিকুর রহমান
সহকারী কলেজ পরিদর্শক
কলেজ পরিদর্শক অফিস

(এই রম্যরচনার সমস্ত ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। বাস্তবের সাথে এর কোনো মিল নেই, কেউ যদি মিল খুঁজে পান তাহলে তা অনিচ্ছাকৃত এবং কাকতালীয় ঘটনা মাত্র।)

দিন-১ : প্রথম ক্লাস

আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দিন। সকালবেলা গেটে ঢোকার সময় বুকের ভেতর এমন উত্তেজনা যেন আমি পড়তে আসিনি, জাতিসংঘের মহাসচিব হতে যাচ্ছি! ভেতরে ঢুকেই বুঝলাম এখানে আসল লড়াই পড়াশোনার নয়, আসল লড়াই লিফটের জন্য লাইনে দাঁড়ানো।

লাইনের এক সিনিয়র বলল, 'ভাই, এই লাইন শেষ হলে তুমি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাবে।' আমার পাশে থাকা নতুন বন্ধু বলল, 'না ভাই, ইঞ্জিনিয়ার না, ক্ষুধার্ত হয়ে যাব।'

এরপর স্যার ক্লাসে ঢুকে প্রথমেই বললেন, 'Welcome to University Life. Here, attendance mark is only 10%.' আমি তৎক্ষণাৎ নোটবুকে লিখলাম Attendance = কী লাভ!

আমার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার এটাই।

দিন-২ : ক্যান্টিন ও লাইব্রেরি আবিষ্কার

লাইব্রেরি খুঁজে না পেলেও ক্যান্টিন একদিনেই খুঁজে পেয়েছি। ক্যান্টিনে গিয়েই বুঝলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল পড়াশোনা এখানেই হয়। চা আর সিঙ্গারার টেবিলে আলোচনা চলে, 'জাতিসংঘ কেন সমস্যার সমাধান করতে পারছে না, ক্রিকেট দলে কে থাকা উচিত আর কার থাকা উচিত নয়..... ইত্যাদি।'

লাইব্রেরিতে প্রথম ঢুকলাম সেদিনই। ছবি তুলে ফেসবুকে দিলাম। ক্যাপশন 'Research Mood!'। এসি রুমে গিয়ে পড়ালেখা করার প্রস্তুতি নিতে নিতেই ঘুম। পরে পাশের টেবিলে দেখলাম, তিনজনের বই খোলা আর সবাই ঘুমাচ্ছে।

মনে হলো, লাইব্রেরি হলো আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে ভালো বিশ্রামের জায়গা।

দিন-১৪ : ক্যাম্পাস প্রেম

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেম যেন এক নন-ক্রেডিটেড কোর্স, পাশ না করলেও ডিগ্রি পাওয়া যায়। কিন্তু করলেই অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়। আমিও একবার সাহস করলাম। জানতে চাইলাম 'তুমি কি আমার ল্যাব পার্টনার হতে চাইবে?' মেয়ে হেসে বলল, 'আমি তো সারাজীবনের পার্টনার খুঁজছি।' সেদিন থেকে আমি বুঝলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাব পার্টনার পাওয়া সহজ নয়, তবে হৃদয় ভাঙার এক্সপেরিমেন্ট পাওয়া খুব সহজ।

এরপর থেকে আমি একা একাই ল্যাব করি। ল্যাবের যন্ত্রপাতিই আমার একমাত্র সঙ্গী।

দিন-৩০ : প্রথম ক্লাস ফাঁকি
আজ আমার জীবনের প্রথম অফিসিয়াল ক্লাস ফাঁকি। বন্ধুরা বলল, 'চল, ক্লাসে গেলে শুধু শুধু মাথা ব্যথা হবে।' আমি রাজি হলাম। কোথায় গেলাম জানেন? ক্যান্টিনে। ফিরে এসে দেখি স্যার নাকি বলেছিলেন, 'আজকের ক্লাসের উপর আগামী সপ্তাহে কুইজ।'

এখন আমি বুঝলাম, ফাঁকি মানে শুধু ক্লাস এড়িয়ে যাওয়া নয়, এটা একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনধারায় বিপত্তি।

দিন-৭০ : স্যারের কৌতুক
আমাদের এক স্যার আছেন, যিনি প্রতিবার একই কৌতুক বলেন, 'তোমাদের পড়াশোনার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তোমাদের ভবিষ্যৎ গুগল-সার্চ নির্ভর।' আমরা সবাই হেসে উঠি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভয়ে কুঁকড়ে যাই। আসলেই তো!
গতবার অ্যাসাইনমেন্ট লিখেছিলাম 'Ctrl+C, Ctrl+V' দিয়ে।

দিন-১২০ : পরীক্ষা যুদ্ধ
আজ মিডটার্ম। আগের সারাদিন লাইব্রেরিতে পড়তে এসেছিলাম, কিন্তু সেখানে এত ভিড় ছিল যে আসল পড়াশোনার বদলে 'এই নশ্বর পৃথিবীতে জীবনটাই তো এক পরীক্ষা, এখানে আবার একাডেমিক পরীক্ষার গুরুত্ব কি খুব বেশি?' সেই আলোচনা করেই সময় কেটে গেল। পরীক্ষার হলে বসে প্রশ্ন দেখে মনে হলো, আমি বোধহয় ভুল পরীক্ষা হলে এসে গেছি। আমার বন্ধু পাশ থেকে ফিসফিস করে বলল, 'ভাই, তুই কি প্রশ্ন পাইছিস?'

আমি উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, পাইছি, কিন্তু সেটা গত বছরের।'

দিন-১৫০ : রাজনীতি ১০১
বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি না করলে নাকি ডিগ্রি অসম্পূর্ণ থাকে। আমি তাই একদিন ক্যান্টিনে গিয়ে জানতে চাইলাম, 'আমাদের কী করতে হবে?' উত্তর এলো 'প্রথমে পোস্টার লাগাও, স্লোগান দাও। তারপর দেখো তোমাকে কোথায় বসানো হয়।'

আমি বুঝলাম, এখানে আসল রাজনীতি হলো, কে কোথায় বসবে, ক্যান্টিনে নাকি ক্লাসে।

দিন-২০০ : প্রেমের মহাসমাপ্তি
একদিন সাহস করে মেয়েটিকে বললাম, 'তুমি কি আমাকে একটু সময় দিতে পারবে?' সে উত্তর দিলো, 'দুঃখিত, আমি বিবিএ-তে পড়ি। তোমার কম্পিউটার সায়েন্সের ফিলোসফি আমার জীবনে খাটবে না।'

এরপর থেকে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার প্রেম শুধু সিঙ্গারার সাথেই চলবে।

দিন-৩০০ : প্রজেক্টের হাহাকার
প্রজেক্ট জমা দেওয়ার ডেডলাইন। আমাদের তিনজনের গ্রুপ আছে, আমার বন্ধু (যে শুধু নাম লেখায়), আমি (যে গুগল থেকে কপি করে আনি) আর আরেক জন (যে প্রিন্ট করার টাকা দেয়)। স্যার দেখে বললেন, 'এটা তো উইকিপিডিয়া থেকে কপি করা!' আমরা উত্তর দিলাম, 'স্যার, উইকিপিডিয়াই তো এখনকার লাইব্রেরি।' স্যার আমাদের মাইনাস মার্ক দিলেন।

আমরা তবুও গর্বিত, কারণ পুরো প্রজেক্ট জমা দিয়েছিলাম এক রাতের মধ্যে।

দিন-৪০০ : শেষ সেমিস্টার
এখন ফাইনাল ইয়ার চলছে। সবাই চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছে, আমি এখনো ক্যান্টিনে বসে ভাবছি, 'এতগুলো বছর গেল, আমি শিখলাম কী?' উত্তরগুলো স্পষ্ট, প্রথমত ২ মিনিটে বন্ধুত্ব করা, ৫ মিনিটে প্রেম ভাঙা, ১০ মিনিটে অ্যাসাইনমেন্ট বানানো আর সারা জীবনের জন্য স্মৃতি তৈরি করা।

দিন-৪৬৫ : সেশনজটের মহিমা

আজ রেজাল্ট বের হলো। চার বছরের প্রোগ্রাম শেষ করলাম প্রায় সাত বছরে। কিন্তু সিনিয়াররা বলল, 'চিন্তা করিস না, এই সেশনজটই তো ক্যাম্পাসের আসল সৌন্দর্য'।

আমি ভাবলাম, সৌন্দর্য যদি এমন হয়, তাহলে কুৎসিত জিনিস কত ভয়ংকর!

দিন-৫১৩ : কনভোকেশন

আজ গাউন পরে ছবি তুললাম। মা-বাবা খুশি, বন্ধুরা খুশি, আমার একটু খালি খালি লাগছে। তবুও মনে মনে বললাম 'প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়, তুমি আমাকে চাকরি শেখাওনি, কিন্তু জীবন ম্যানেজ করার কৌশল শিখিয়েছ। ক্যান্টিন থেকে ক্লাস, প্রেম থেকে রাজনীতি, সবকিছু মিলিয়ে তুমি আসলেই আমার জীবনের সেরা জায়গা।'

উপসংহার

এখন যখন পিছনে তাকাই, হাসি পায়, আবার চোখে পানিও আসে। হয়তো ক্লাস ফাঁকি দিয়ে অনেককিছু মিস করেছি, কিন্তু বন্ধুদের সাথে যে স্মৃতি বানিয়েছি, সেটা কোনো সিলেবাসে ছিল না, তবুও আমার জীবনের সবচেয়ে বড় 'কোর্স' হয়ে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় আসলে কোনো ডিগ্রির নাম নয়, এটা হলো একটা সময়, কতগুলো মানুষ, হাজার হাজার স্মৃতি, আর একখানা জীবনের গল্প।

লরেন্স লেমিউ : অলিম্পিকের পদকবিহীন কিংবদন্তি

সঞ্জয় বসাক পার্থ
সহকারী অধ্যাপক
ডিপার্টমেন্ট অব মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম

সুইজারল্যান্ডের লুজানে অবস্থিত অলিম্পিক জাদুঘরে সুসজ্জিত কাচের বাক্সে রাখা আছে একটি পদক। যার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখা আছে, 'একজন অলিম্পিক অ্যাথলেটের জন্য এই পদকটি সবচেয়ে সম্মানজনক পদকগুলোর মধ্যে একটি'। পদকটির আনুষ্ঠানিক নাম পিয়েরে দ্য কুবার্তা পদক। আধুনিক অলিম্পিকের জনক হিসেবে খ্যাত কুবার্তার নামে ১৯৬৪ অলিম্পিক থেকে এই পদকটি দেওয়া শুরু হয়। কিন্তু এই পদক জেতার সৌভাগ্য সব অ্যাথলেটের হয় না। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির পক্ষ থেকে এটি কেবল সেই সকল ক্রীড়াবিদদেরই দেওয়া হয়, যারা অলিম্পিক গেমসে খেলাধুলার আদর্শ ও মূল্যবোধ অটুট রেখে ক্রীড়াসুলভ মানসিকতা প্রদর্শন করেন, এবং বিশ্ববাসীর সামনে অনন্য নজির স্থাপন করেন। অলিম্পিকের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত মাত্র ১৭ জন এই পদক জিতেছেন। তাঁদেরই একজন হলেন লরেন্স লেমিউ।

ঘটনাটি ১৯৮৮ সালের। দ্বিতীয়বারের মতো এশিয়াতে বসেছে অলিম্পিকের আসর, দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে। তবে সেইলিং ইভেন্টটি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল সিউল থেকে ৪৫০ কিলোমিটার দূরে বুসানের খোলা সমুদ্রে। তারকা সেইলর লরেন্স লেমিউ আগের অলিম্পিকে দারুণ লড়াই করেও শেষপর্যন্ত পদক পাননি। এই অলিম্পিকে তাঁর প্রতি সবার তাই আলাদা আগ্রহ ছিল। গত দুই বছরের দারুণ পারফরম্যান্স দিয়ে লেমিউও জানান দিচ্ছিলেন, পদক জিততেই এবার অলিম্পিকে এসেছেন তিনি।

৩২ বছর বয়সি কানাডীয় নিজের ইভেন্টের শুরুটাও করলেন দুর্দান্ত। মোট ৭ রাউন্ড রেসের ৪ রাউন্ড শেষে প্রথম দিন শেষ করলেন প্রথম স্থানে থেকে। পরদিন সকালে পঞ্চম রাউন্ডে যখন নামছেন, পেলেন সেইলিংয়ের জন্য আদর্শ আবহাওয়া। তবে কিছুক্ষণ পরেই আচমকা প্রকৃতির রূপ বদলে গেল। দমকা বাতাস বইতে শুরু করল ঘণ্টায় ৩৫ নট বেগে। বাড়তে থাকা স্রোতের কারণে সৃষ্ট ঢেউগুলো একেকটা প্রায় দেড়তলা উঁচু ভবনের সমান। এত তীব্র বাতাস আর বিশাল ঢেউয়ের কারণে সবাই নিজেদের ডিঙি সোজা রাখতেই হিমশিম খাচ্ছিলেন। তবুও অভিজ্ঞতা আর দক্ষতার মিশেলে লেমিউই সবার থেকে এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু বিশাল ঢেউয়ের কারণে প্রায় ৮ ফুট উঁচু কমলা রঙের দিকনির্দেশনাটি দেখতে পাননি, ফলে একটি চক্র সঠিকভাবে ঘুরতে ব্যর্থ হওয়ায় ১ পয়েন্ট জরিমানা হলো, প্রথম থেকে নেমে গেলেন দ্বিতীয় স্থানে।

একটু পরেই ঘটল দুর্ঘটনা। না, দুর্ঘটনার শিকার লেমিউ নন, পাশেই চলতে থাকা অন্য একটি ইভেন্টে সিঙ্গাপুর দলের ডিঙি স্রোতে উলটে গেছে। একজন ছিটকে পড়েছেন তুমুল স্রোতের মাঝে, মাথায় আঘাতও পেয়েছেন বেশ। অপরজন উলটে যাওয়া ডিঙি ধরে কোনোমতে ভেসে আছেন।

রেসের প্রায় মাঝপথে চলে আসা লেমিউ দূর থেকে দেখতে পেলেন পুরো ঘটনা। দুই সিঙ্গাপুরি প্রতিযোগী জোসেফ চ্যান এবং শ হ্যার সিউ তখন আক্ষরিক অর্থেই অকূল পাথারে। আশেপাশে সাহায্য করার মতো নেই কেউই। আচমকা সিদ্ধান্তে নিজের রেস বাদ দিয়ে তাদের সহযোগিতার জন্য ডিঙি বাইতে শুরু করলেন লেমিউ।

সাহায্যপ্রার্থী দুজনকে উদ্ধার করার কাজটা মোটেও সহজ ছিল না। বিশাল ঢেউগুলো টলিয়ে দিচ্ছিল লেমিউয়ের ডিঙিকে। অভিজ্ঞতার সবটুকু কাজে লাগিয়ে লেমিউ নিজের ডিঙিকে উলটে যাওয়া থেকে আটকালেন, এরপর খাবি খেতে থাকা চ্যানকে উদ্ধার করলেন সমুদ্র থেকে। চ্যানকে সাথে নিয়ে এরপর গেলেন উলটে যাওয়া ডিঙির দিকে। ততক্ষণে কুলন্ত আরেক প্রতিযোগী সিউয়ের শরীরের বিভিন্ন জায়গা কেটে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। তবে এক ডিঙিতে দুজনের বেশি ওঠা সম্ভব নয়, সিউকে তাহলে কোথায়

তুলবেন? কোনো কিছু না-ভেবে লেমিউ নিজেই নেমে গেলেন পানিতে, এরপর সিউকে বসালেন নিজের ডিঙিতে। উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে ডিঙি ধরে রেখে অপেক্ষায় থাকলেন কোরিয়ান নেভির পেট্রোল বোটের।

চিত্র : অলিম্পিক ইতিহাসে সাহসিকতার সমার্থক হয়ে থাকা কানাডীয় অ্যাথলেট লরেন্স লেমিউ

প্রায় মিনিট সাতেক এভাবেই সমুদ্রে ভেসে থেকে দুই আহত প্রতিযোগীকে সামলালেন লেমিউ। এরপর নেভি বোট এসে দুজনকে উদ্ধার করলে লেমিউ আবার ফিরে যান নিজের প্রতিযোগিতায়। তবে ততক্ষণে বাকিদের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছিলেন অনেকখানি, শেষ পর্যন্ত ৩২ জনের মধ্যে ২২ তম হয়ে ওই পঞ্চম রেসটি শেষ করেন।

লেমিউয়ের বীরত্বপূর্ণ কাজকে সম্মান জানিয়ে আন্তর্জাতিক ইয়ট রেসিং ইউনিয়ন দুর্ঘটনার পূর্বে থাকা অবস্থান পুনর্বহাল করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে অবস্থান ফিরে পেলেও লেমিউ পয়েন্ট পাবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেয় সংস্থাটি। যে কারণে ৭ রেসের পর ১১ তম অবস্থানে থেকে নিজের ইভেন্ট শেষ করেন লেমিউ।

তবে পদকজয়ীরা কেউ নন, ইভেন্ট শেষে সমস্ত আলো কেড়ে নেন লেমিউ। মানবিকতা, সাহসিকতা ও দৃঢ় মনোবলের কারণে লেমিউয়ের নাম তখন সবার মুখে মুখে। অলিম্পিক পদক জেতার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হবে জেনেও ওই মুহূর্তে এমন স্বার্থহীন সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছিলেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে লেমিউ বলেছিলেন, 'সেইলিংয়ের প্রথম এবং অত্যাবশ্যকীয় নিয়ম হলো, যদি দেখো কেউ বিপদে পড়েছে, সাথে সাথে তাকে সাহায্য করো। ওই অবস্থায় আমাকে যেতেই হতো। যদি আমি সাহায্যের জন্য না-যেতাম, তাহলে বাকি জীবন আমি এই সিদ্ধান্তের জন্য আফসোস করতাম। সত্যি বলতে ওই মুহূর্তে এতকিছু আমি চিন্তাও করিনি। তখন আমার কেবল একটাই কাজ ছিল, ওদের সাহায্যের জন্য ছুটে যাওয়া'।

তবে এমন কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের পর লেমিউকে খালি হাতে ফেরালে অলিম্পিকের মূল স্পিরিটকেই অবমাননা করা হতো। সিউল অলিম্পিকের সমাপনী অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি হুয়ান অ্যান্টোনিও সামারাঞ্চ লেমিউয়ের গলায় পিয়েরে দ্য কুবার্তা পদক পরিয়ে দেন।

এরপর আর কোনো অলিম্পিকে অংশ না নেয়া লেমিউ ১৯৯০ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রৌপ্যপদক জিতেছিলেন, স্বর্ণপদক জিতেছিলেন ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ও প্যান আমেরিকান গেমসে। অবসরের পর সেইলিং কোচের দায়িত্ব পালন করা লেমিউকে এখনো আন্তর্জাতিক আসরে দেখা যায়, পুরোনো সেই দুই বন্ধু জোসেফ চ্যান এবং শ হার সিউয়ের সাথে।

প্রত্যেক অলিম্পিয়ানের আজীবনের লালিত স্বপ্ন থাকে দেশের পতাকা হাতে অলিম্পিকের পোডিয়ামে দাড়ানো। কানাডীয় অলিম্পিয়ান লরেন্স লেমিউয়ের সেই স্বপ্ন কোনোদিন পূরণ হয়নি। তবে তাঁর ঝুলিতে রয়েছে এমন এক বিরল পদক, অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে যে সৌভাগ্য হয়েছে হাতেগোনা কয়েকজনের। ব্যক্তিগত সাফল্য ও প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির উর্ধ্বে উঠে যিনি শুনিয়েছিলেন মানবিকতার জয়গান, ক্রীড়াসুলভ মানসিকতার অনুপম নিদর্শনী দিয়ে জিতেছিলেন লাখো মানুষের হৃদয়। অলিম্পিক গেমসের তিনটি মূল আদর্শ রয়েছে-উৎকর্ষতা, পারস্পরিক সম্মান ও বন্ধুত্ব। লেমিউ এই তিন আদর্শকেই বানিয়েছিলেন তাঁর মূলমন্ত্র; যে কারণে আজও অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

স্রষ্টার রাহে মুসাফিরের যাত্রা

তোফায়েল আহমেদ
সহকারী পরিচালক
ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনমিক্স

এ বিশ্বজাহানের মালিক সুন্দর বসবাসযোগ্য পৃথিবীতে তাঁর অগণিত সৃষ্টির মধ্যে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব করেছেন মানুষকে। মানুষের প্রধান কাজ হলো তাঁর স্রষ্টার ইবাদত করা। মানুষ কীভাবে তাঁর স্রষ্টার ইবাদত করবে, কীভাবে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবে তার জন্য নাজিল করেছেন আসমানি কিতাব এবং সে কিতাবের মাধ্যমে মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য বার্তাবাহক হিসেবে প্রেরণ করেছেন অসংখ্য নবি রাসুলকে। এক স্রষ্টায় বিশ্বাসী হিসেবে একজন মুসলিমের প্রধান কাজ হলো আল্লাহর সান্নিধ্যলাভের মাধ্যমে এবং তাঁর হুকুম-আহকাম পরিপালনের মাধ্যমে পরকালের জীবনের মুক্তি অর্জন। পৃথিবীতে আগমনকারী সকল মুসলিমের জন্য স্রষ্টার নৈকট্য লাভের জন্য ইবাদতের শ্রেষ্ঠতম স্থান হলো পবিত্র কাবা শরীফ বা মাসজিদুল হারামাইন। সারা বিশ্বের মুসলিমদের তীব্র মনোবাসনা থাকে জীবদ্দশায় আল্লাহর প্রিয় হাবিবের নির্দেশিত পথে মহান রবের পবিত্র কাবাঘরে ইবাদত করা, তাঁর কাছে গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পরকালে নাজাতের ব্যবস্থা করা। মহান রব তাঁর পবিত্র ঘরে জিয়ারতকারীদের জন্য অনেক সুসংবাদ বর্ণনা করেছেন। এ পবিত্র ঘরে ইবাদতের অন্যতম মাধ্যম হলো হজ্জ বা ওমরাহ সম্পন্ন করা। মহান রব তাঁর প্রিয় ঘরে ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে তার মুসাফির গোলামকে সপরিবারে ওমরাহ পালনের তৌফিক দিয়েছেন-আলহামদুলিল্লাহ! প্রিয় পাঠকগণের নিকট ছোট্ট লেখনীর মাধ্যমে সহজ ভাষায় রবের অশেষ কৃপায় তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে এ মুসাফিরের যাত্রার অভিজ্ঞতা ও অর্জনটুকু ছোট্ট পরিসরে তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াস রইল।

ওমরাহ পালনের ইতিহাস ও এর মূল আমল

হজ্জ ও ওমরাহ পালনের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে বাইতুল্লাহ ও সাফা-মারওয়াকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলেন-'নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে কেউ (কা'বা) ঘরের হজ্জ বা ওমরাহ সম্পন্ন করে, এ দুটির মধ্যে সাঈ করলে তার কোন পাপ নেই। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো সৎকাজ করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ উত্তম পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।' পবিত্র কোরআনে ওমরাহ হলো হজ্জের সময় ছাড়া অন্য যেকোনো সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইহরাম অবস্থায় কাবাঘরের চারপাশে তাওয়াফ (পরিভ্রমণ) ও সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যখানে সাঈ (দৌড়ানো) করাসহ নির্দিষ্ট কিছু কাজ। এটি হজ্জ থেকে ভিন্ন একটি সুন্নাত আমল, যা বছরজুড়ে পালন করা যায়। ওমরাহ হজ্জের তুলনায় একটি ছোট সংস্করণ, কিন্তু হজ্জের মতো বাধ্যতামূলক নয়, হজ্জের মতো শর্ত পূরণ করা আবশ্যক নয়, তবে এটি একটি সুন্নাত আমল। ওমরার প্রধান উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আল্লাহ কুরআনে বলেন- 'এবং আমরা ইব্রাহীম ও ইসমাঈল-কে আদেশ দিয়েছিলাম যেন তারা আমার ঘরকে তাওয়াফকারীদের, ই'তিকাফকারীদের, রুকু ও সাজদাহকারীদের জন্য পবিত্র করে রাখে'। মহানবি (সা.) মক্কা হতে মদিনায় হিজরতের পর হুদাইবিয়া চুক্তির মাধ্যমে সপ্তম হিজরিতে প্রথম ওমরাহ সম্পন্ন করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তার জীবদ্দশায় চারবার ওমরাহ করেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়।

ওমরার মূল আমলের পরিধি খুব ছোট। (ক) ইহরাম বাঁধা : ওমরাহর জন্য নির্ধারিত সময়ে একটি বিশেষ অবস্থায় প্রবেশ করা; (খ) তাওয়াফ : কাবা শরিফকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা; (গ) সাঈ : সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যখানে সাতবার আসা-যাওয়া করা; এবং পরিশেষে (ঘ) মাথার চুল কাটা : সাঈ সম্পন্ন করার পর পুরুষদের জন্য মাথা মুণ্ডন বা চুল কামানো এবং নারীদের জন্য চুলের অগ্রভাগের কিঞ্চিৎ পরিমান কাটা। কাবা শরীফ তাওয়াফে, এমনকি কাবার দিকে তাকিয়ে থাকাতেও রয়েছে অনন্য ফজিলত। তাওয়াফ অর্থ চক্কর দেওয়া বা প্রদক্ষিণ করা। হাজরে আসওয়াদের কোণ থেকে কাবার দরজা অতিক্রম করে চারদিক ঘুরে আবার হাজরে আসওয়াদে এসে পৌঁছালে এক চক্কর হয়। এভাবে সাতটি চক্কর বা প্রদক্ষিণের মাধ্যমে এক তাওয়াফ হয়। তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহিমে দুই রাকাত নামাজ পড়লে একটি গোলাম আজাদ করার সওয়াবসহ অনেক মর্যাদা লাভ করা যায়। তাওয়াফের প্রতিটি কদমে আল্লাহ তা'লা তাওয়াফকারীর জন্য ১০টি নেকি লেখেন, ১০টি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।' কাবা শরিফের ওপর আল্লাহ তায়ালা প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন। তাওয়াফকারী, বায়তুল্লাহ প্রাঙ্গণে নামাজ আদায়কারী এমনকি যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর (কাবা) দিকে তাকিয়ে থাকার সৌভাগ্য লাভ করে সে-ও সেই রহমত পেয়ে ধন্য হয়। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তায়ালা প্রতিদিন বায়তুল্লাহর ওপর ১২০টি রহমত নাজিল করেন, তন্মধ্যে ৬০টি রহমত শুধু তাওয়াফকারীদের জন্য; ৪০টি মাসজিদুল হারামের মধ্যে নামাজ আদায়কারীদের জন্য এবং অবশিষ্ট ২০টি ওইসব লোকের (সৌভাগ্যবান) জন্য যারা (আবেগ ও ভালোবাসায়) বায়তুল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকে।' কাবার পরশে ধন্য হয়েছে এর চারপাশ ঘিরে থাকা মাসজিদুল হারামও। লাভ করেছে সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদের মর্যাদা। যে তিনটি মসজিদের জন্য সফর করা যায় তার প্রথমটিই মাসজিদুল হারাম। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, 'শুধু তিনটি মসজিদের উদ্দেশে সফর করা যাবে- আমার এই মসজিদ (মাসজিদুন নববি), মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুল আকসা।' হজরত জাবির (রা.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, 'আমার এ মসজিদে এক নামাজ অন্য মসজিদে হাজার নামাজ থেকেও উত্তম। তবে মাসজিদুল হারাম ছাড়া। কেননা, মাসজিদুল হারামে এক নামাজ অন্য মসজিদের এক লাখ নামাজের চেয়ে উত্তম।' (আহমাদ)।

মুসাফিরের যাত্রা

সারাবিশ্বের সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মাঝে আল্লাহর পবিত্র কাবাঘর ও রাসুলের পবিত্র রওজা মোবারক মসজিদে নববিতে ইবাদাত করার তীব্র মনোবাসনা রয়েছে। মহান রব তাঁর অশেষ কৃপা ও মেহেরবানিতে সপরিবারে পবিত্র কাবা ঘরে ওমরাহ পালনসহ রাসুলের রওজা মোবারক ও ইসলামের স্মৃতিবিজরিত স্থানসমূহ জিয়ারতের মাধ্যমে মুসাফিরের মনোবাসনা পূর্ণ করেছেন। আমরা গত ৫ ফেব্রুয়ারি হতে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ সময়ে আল হিকমাহ ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস-এর ব্যবস্থাপনায় পবিত্র ওমরাহ পালন করেছি। মাসজিদুল হারাম বা পবিত্র কাবাতে ইবাদাত করার অনুভূতি সত্যিকার অর্থে অসাধারণ। মহান রবের দরবারে এই ইবাদত স্থানের গুরুত্ব যে সর্বশ্রেষ্ঠ তা এখানে না-আসতে পারলে কারও পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ক্ষণিকের এ যাত্রায় মহান আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে তাঁর পবিত্র ঘরে ওমরাহ পালনসহ ইবাদত করার তৌফিক দিয়েছেন, দিয়েছেন তাঁর কাছে নাজাতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ। সেই সাথে দিয়েছেন মদিনাতুল মনোয়ারাতে তাঁর প্রিয় রাসূলের রওজা শরিফে উপস্থিত হয়ে প্রিয় রাসুলকে সালাম দেওয়ার সুযোগ এবং রিয়াজুল জান্নাতে নামাজ আদায়ের বিরল সৌভাগ্য। এছাড়া ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ জিয়ারতের তৌফিক দিয়েছেন। মক্কা ও মদিনার দিন-রাতের প্রতিটি ক্ষণ ছিল স্রষ্টাকে হৃদয়াঙ্গম করার অসাধারণ মুহূর্ত।

মুসাফিরের অভিজ্ঞতা

ইবাদতের জন্য আল্লাহর জমিনে সর্বপ্রথম স্থাপিত হয় পবিত্র কাবাঘর। আল্লাহ তা'লা বলেন, 'নিশ্চয়ই প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, তা মক্কায়। যা বরকতময় ও সৃষ্টিকুলের জন্য হেদায়েত।' মক্কার মাসজিদুল হারামের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত ঘরখানি পবিত্র কাবা আর কাবার চারপাশে গড়ে ওঠা আঙিনাই মাসজিদুল হারাম। কাবা ও মাসজিদুল হারামের সঙ্গে পৃথিবীর প্রায় ২০০ কোটিরও বেশি মুসলমানের অন্তর আধ্যাত্মিক সুতায় বাঁধা। এখানের প্রতিটি মুহূর্তে মনকে এক কল্পনাতীত জগতে নিয়ে যায়। পৃথিবীর সকল মায়া মমতা, ভালোবাসা, আত্মীয়তা ও ধন সম্পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা

কোনোকিছুই এ পবিত্র পরিবেশের আবহকে ম্লান করতে পারে না। সবচেয়ে অবাক ও আশ্চর্যের বিষয় হলো সারা বিশ্বের অগণিত নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ, নিষ্পাপ শিশুরা এক অলৌকিক শক্তির প্রভাবে আকৃষ্ট হয়ে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের অভিপ্রায়ে দিনরাত ইবাদতে মশগুল থেকে শোকর গোজার করছে, ইহজগতের কৃতকর্মের জন্য পরকালে নাজাতের জন্য নিজেকে মিসকিনের ন্যায় সোপর্দ করে দিচ্ছে। এখানে কারও কোনো রাগ-অভিমান নেই। নেই কোনো প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হতাশা। সবাই অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মহান রব ও তাঁর হাবিবের সন্তুষ্টির আশায় পাগলপ্রায়। নিজ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পবিত্র কাবাঘরকে নিকটতম স্থান থেকে দেখার ও হাতে স্পর্শ করার যে অসাধারণ অনুভূতি-তা কেবল বাস্তবিকভাবে অনুভব করা সম্ভব।

ইমান মজবুতের চাবিকাঠি

মক্কা ও মদিনার এক একটি ইসলামের ঐতিহাসিক নিদর্শন ও ইবাদতের স্থান একজন মুসলিমের ঈমানকে মজবুত করার এক একটি উপকরণ। আরাফার ময়দান, উহুদ পর্বত, হেরাগুহা, মিনা, সাফা ও মারওয়া, কুবা মসজিদ, কিবলাতিন মসজিদ, জান্নাত আল-বাকি উল্লেখযোগ্য। এসকল ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জিয়ারত ও ইবাদাতের মাধ্যমে একদিকে যেমন শত শত বছর পূর্বে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোকে হৃদয়াঙ্গম করা যায় তেমনি এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবনের মাধ্যমে নিজের ইমানি শক্তি আরও সুদৃঢ় হয়, স্রষ্টার ক্ষমতা, মহানুভবতা, ভালোবাসার গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। ওরমাহ পালনকারী একজন মুসাফিরের যে সংকল্পগুলো পালনে আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন তা হলো-

- যে চোখ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা কাবা দর্শনের তাওফিক দিয়েছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হেরেম দেখিয়েছেন, সেই চোখের হেফাজত করা, চোখের অন্যায় ব্যবহার না-করা।
- হাদিসে আছে, 'যে হজ্জ/ওমরাহ করল এবং সব অশ্লীলতা ও গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকল, সে সদ্যোজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে গেল। তাই আল্লাহ তায়ালার কাছে আশা রাখা, তিনি আমার হজ্জ/ওমরাহ কবুল করেছেন এবং এর বদৌলতে আমাকে নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ করেছেন। ইনশাআল্লাহ! আমি পাপমুক্ত থাকার চেষ্টা করব। আল্লাহ না করুন কোনো গুনাহ হয়ে গেলেও তাৎক্ষণিক তাওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইব।
- আল্লাহ তা'লা যখন তাঁর ঘর দেখা ও জিয়ারত করার তাওফিক দিয়েছেন, তখন এই নিয়ামতের মর্যাদা রক্ষা করা, এবং আল্লাহর অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ পর্যন্ত তাঁর শোকর আদায় করতে থাকা।

মুসাফির যেসকল ভুল করেন

- হজ্জ বা ওমরাহ পালনের জন্য অনেকে যাত্রা করলেও সহি ও শুদ্ধভাবে ইবাদত ও অন্যান্য করণীয় বিষয়ে পূর্ব প্রস্তুতি সঠিকভাবে নিতে পারেন না, ফলে মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভবনা প্রবল থাকে।
- এ সময় অনেক হাজি সাহেব অপরের সমালোচনা ও দোষচর্চা করেন, এমন পবিত্র স্থানে যা একেবারেই পরিত্যাজ্য।
- অনেক হাজি সাহেব একসাথে সমস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন-এটি সুন্নত পরিপন্থি কাজ। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম ভিন্ন ভিন্নভাবে তালবিয়া পাঠ করেছেন।
- মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় সুনির্দিষ্ট কোনো দোয়া নির্ধারণ করা। অথচ মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় সুনির্দিষ্ট কোন দোয়া নেই।
- যাত্রাপথে অনেকে পাক পবিত্রতা, নিয়মমাফিক ইবাদত-এসবের বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন না।
- ইবাদতের পরিবর্তে আধুনিক প্রযুক্তির নেশা (মোবাইল) হতে বের হতে পারেন না। ফলে কাবা শরিফসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ইবাদাতের পরিবর্তে ছবি তোলা, ভিডিও করা ইত্যাদি জাগতিক কাজে মশগুল থাকা হয়।

ইহ জগতের কর্মকাণ্ড শেষে আমাদের সবাইকে একদিন মহান রবের দরবারে উপস্থিত হতে হবে। হাশরের ময়দানের আমাদের শাফায়াতের কান্ডারী রাসুলে করীম (সা.)-এর সুপারিশ ও মহান রবের মেহেরবানি ছাড়া প্রত্যেক মুমিন -মুসলমানের জন্য আর কোন দ্বিতীয় আশ্রয়স্থল থাকবে না। সেজন্য মহান রবের হুকুম-আহকাম ও তাঁর প্রিয় হাবিবের দেখানো প্রতিটি নেক কাজে আমাদের হতে হবে আন্তরিক, থাকতে হবে নিজের ও পরিবার পরিজনের চেয়েও উত্তম ভালোবাসা, পালন করতে হবে দায়িত্ব। রবের দরবারে তাঁর প্রিয় বান্দার কোন্ ইবাদতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে-তা কেবল সৃষ্টিকর্তাই জানেন। তাই একজন মুসাফিরের যাত্রা হতে হবে এই নিয়তে-যেন তার এ যাত্রার শেষ গন্তব্য তাকে সেই সফলতা এনে দিতে পারে, পারে তার প্রিয় রবের সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভ করতে, প্রিয় রাসুলের শাফায়াতের অংশীদার হতে। আমাদের সকলের আগামী দিনের সেই যাত্রা হোক কল্যাণকর, আমাদের ওমরাহ ও হজ্জ হোক মাবরুর, যাত্রা শেষে মুসাফির হোক সদ্যভূমিষ্ট নিষ্পাপ শিশুর ন্যায় পবিত্র ও খাঁটি মুমিন।

তথ্যসূত্র:

- আল কোরআন।
- হাদিস শরিফ।
- Photo: https://www.itsholidaysltd.com/
- https://www.itsholidaysltd.com/history-of-performing-umrah
- https://www.hadithbd.com
- দৈনিক সংবাদপত্র ও গুগল।

বৃদ্ধাশ্রমে জীবন : সমাজের ব্যর্থতা নাকি পারিবারিক অবহেলা?

জান্নাতুল বাকিয়া জেনি
প্রভাষক
ডিপার্টমেন্ট অব সোশিওলজি

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজ ও পারিবারিক কাঠামোয় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। নগরায়ণ, প্রযুক্তিনির্ভর জীবনধারা, কর্মজীবনের চাপ, অভিবাসন এবং যৌথ পরিবার থেকে একক পরিবারের দিকে পরিবর্তনগুলি পারিবারিক সম্পর্ক ও দায়িত্ববোধে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে 'বৃদ্ধাশ্রম' নামে এক নতুন বাস্তবতা জন্ম নিয়েছে। প্রশ্ন থেকে যায়, এই পরিস্থিতির দায় কার? পরিবার, সমাজ নাকি রাষ্ট্রের?

বিশ্বব্যাপী গড় আয়ু বৃদ্ধির সঙ্গে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিসংঘের অনুমান, ২০৫০ সালে ৬৫ বছর ও তার বেশি বয়সিদের সংখ্যা বিশ্বজনসংখ্যার প্রায় ১৬% ছাড়িয়ে যাবে। বাংলাদেশও এই প্রবণতার অংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS, ২০২২) তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রায় দেড় কোটি প্রবীণ রয়েছেন, যাদের অনেকেই পারিবারিক ও সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। যদিও বৃদ্ধাশ্রম একটি বিকল্প সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবু অনেক সময় একে পারিবারিক দায়িত্বের অবহেলা বা অনীহার প্রতিফলন হিসেবেও দেখা হয়।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবারে প্রবীণরা পারিবারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে সম্মানিত ছিলেন। তাঁরা শুধু অভিভাবকই নন, পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তেও অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু আধুনিক জীবনের কর্মব্যস্ততার কারণে সন্তানরা অধিকাংশ সময় দূরে থাকায় প্রবীণরা একাকিত্ব ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এর ফলে অনেক পরিবার দায়িত্ব থেকে সরে এসে বৃদ্ধাশ্রমকে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বেছে নিচ্ছে। যদিও পরিস্থিতির কারণে বৃদ্ধাশ্রম প্রয়োজনীয় হতে পারে, সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি আদর্শ নয়। বিশেষ করে, যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন সন্তানদের লালনপালনে, তাঁদের জন্য জীবনের গোধূলিতে এমন বিচ্ছিন্নতা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত শিল্পী নচিকেতা চক্রবর্তীর গান বৃদ্ধাশ্রম বর্তমান সামাজিক বাস্তবতার এক দুঃখজনক প্রতিচ্ছবি :

'ছেলে আমার মস্ত মানুষ, মস্ত অফিসার
মস্ত ফ্ল্যাটে-যায় না দেখা এপার-ওপার।
নানান রকম জিনিস আর আসবাব দামি দামি,
সবচেয়ে কমদামি ছিলাম একমাত্র আমি।
ছেলের আমার, আমার প্রতি অগাধ সম্ভ্রম
আমার ঠিকানা তাই, বৃদ্ধাশ্রম।'

এই কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো শুধু বেদনাদায়ক নয়, বর্তমান সমাজের কঠোর প্রতিচ্ছবি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সত্ত্বেও অনেক সন্তানের হৃদয়ে বাবা-মায়ের স্থান ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে।

সমাজতাত্ত্বিকভাবে দেখা যায়, একক পরিবারের বৃদ্ধি, উভয় পিতামাতার কর্মজীবী হওয়া এবং জীবনধারার পরিবর্তনের কারণে প্রবীণরা প্রায়ই পারিবারিক যত্ন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ফলে তাঁদের মানসিক ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজন বেড়ে গেছে, আর বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ এটি। তবে বৃদ্ধাশ্রম কেবল আশ্রয়ের জায়গা নয়, বরং এটি হওয়া উচিত মর্যাদাপূর্ণ জীবনের সহায়ক

প্রতিষ্ঠান। সমাজ ও রাষ্ট্রের যৌথ উদ্যোগ ছাড়া এটি নিঃসঙ্গতার প্রতীক হয়ে দাঁড়াতে পারে, যা প্রবীণদের শেষ জীবনকে কঠিন করে তোলে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS, ২০২২) তথ্যানুযায়ী, দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯% প্রবীণ। জাতিসংঘের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে প্রবীণদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে তিন কোটিতে পৌঁছতে পারে। তবুও প্রবীণদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও আবাসনের যথাযথ ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। নিবন্ধিত বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা খুবই কম, অধিকাংশই বেসরকারি বা এনজিও ভিত্তিক। সরকারি 'বয়স্ক ভাতা' থাকলেও তা সীমিত ও জটিল প্রক্রিয়ার। গবেষণায় দেখা গেছে, অনেক প্রবীণ নিরাপত্তা ও মানসিক প্রশান্তির অভাবে নিজে থেকেই বৃদ্ধাশ্রমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন; আবার অনেকেই বাধ্য হয়ে আশ্রয় নেন, কারণ পরিবারের অবহেলা বা সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতার শিকার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০১৭ সালের একটি গবেষণায় উঠে এসেছে, ৬৮% নারী ও ৫১% পুরুষ প্রবীণ পারিবারিক অবহেলা ও নিঃসঙ্গতার কারণে বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নিয়েছেন। ৭৪% প্রবীণ মনে করেন, তাদের পরিবার তাদের বোঝা হিসেবে দেখে। যদিও ৫৯% প্রবীন সেখানে মানসিক শান্তি পেলেও ভালোবাসার অভাব অনুভব করেন। বেশিরভাগই মনে করেন, পরিবারে তাদের আর প্রয়োজন নেই। বৃদ্ধাশ্রমের ব্যাপকতা শুধুমাত্র পারিবারিক ব্যর্থতা নয়, এটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর জটিল প্রতিফলন। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র তিন পর্যায়েই দায় প্রশ্নবিদ্ধ।

ট্যালকট প্যারসন্সের 'Structural functionalism' বা 'কাঠামোগত কার্যকারিতা' অনুযায়ী, পরিবার সামাজিকীকরণ ও যত্নের প্রধান প্রতিষ্ঠান। যখন পরিবার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান দুর্বল হয়ে বিকল্প নিরাপত্তার প্রয়োজন হয় (Parsons, ১৯৫১)। এমিল দুরখেইমের 'অ্যানোমি' তত্ত্ব ব্যক্তিজীবনে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও মানসিক সংকটের কথা তুলে ধরে (Durkheim, ১৮৯৭)। বৃদ্ধাশ্রমে প্রবীণদের যাওয়া এই বিচ্ছিন্নতার প্রতিফলন। যৌথ পরিবারের ভাঙন, উভয় পিতামাতার কর্মজীবী হওয়া এবং নগরায়ণের চাপ প্রবীণদের সামাজিক ও পারিবারিক সুরক্ষা কমিয়েছে (Bengston et al., ২০০৫)।

রাষ্ট্রের ভূমিকা অপরিহার্য। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি শুধু কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সীমাবদ্ধ থাকে, প্রবীণরা উপেক্ষিত হন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO, ২০১৫) প্রবীণদের জন্য 'বয়সবান্ধব নীতি' গ্রহণের আহ্বান জানায়, যা মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও সম্মানজনক জীবন নিশ্চিত করে। তাই প্রয়োজন একটি সমন্বিত কাঠামো, যেখানে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রবীণদের মর্যাদা, নিরাপত্তা ও সেবার অধিকার সম্মিলিতভাবে নিশ্চিত করবে। মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও সহানুভূতিশীল সমাজবোধ প্রবীণদের জীবন মর্যাদাপূর্ণ ও নিরাপদ করবে।

বিভিন্ন ধর্ম প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়িত্ব পালনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। ইসলামে পিতামাতার প্রতি সম্মান ও যত্ন আল-কুরআনে স্পষ্টভাবে নির্দেশিত:

> **'তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই এবাদত করো এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। যদি তাঁদের মধ্যে কেউ-বা উভয়েই বার্ধক্যে পৌঁছে, তাহলে তাদের 'উহ্' পর্যন্ত বলো না এবং তাদের ধমকাও না, বরং তাঁদের সঙ্গে সদয় ও শিষ্টাচারপূর্ণভাবে কথা বলো।** (সূরা আল-ইসরা, আয়াত ২৩)

খ্রিষ্টান ধর্মেও 'তোমাদের পিতা ও মাতাকে সম্মান করো' (Exodus ২০:১২) প্রবীণদের নির্দেশ করে।
হিন্দু ধর্মে 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব' অর্থাৎ মা-বাবাকে দেবতার সমান মনে করে তাদের সেবাকে ধর্মীয় তপস্যা হিসেবে গণ্য করা হয়। সুতরাং প্রবীণদের বিচ্ছিন্নতা শুধু সামাজিক নয়, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও বঞ্চনার প্রকাশ।

বাংলাদেশে প্রবীণদের দেখভাল এখনো মূলত নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত। জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা-২০১৩ প্রবীণদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও আর্থিক সহায়তার কথা বললেও তা আইনগত বাধ্যবাধকতা নয়। পারিবারিক আদালত আইন ও দণ্ডবিধির কিছু ধারা প্রবীণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিলেও সন্তানের অবহেলা প্রতিরোধে যথেষ্ট নয়। এ প্রেক্ষাপটে প্রবীণ কল্যাণ আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেখানে সন্তানের বাবা-মায়ের দেখভাল বাধ্যতামূলক হবে, ভারতের অনুকরণে। তবে আইন একা যথেষ্ট নয়; পারিবারিক মূল্যবোধ পরিবর্তন, সামাজিক সচেতনতা ও রাষ্ট্রীয় সমর্থন অপরিহার্য।

প্রবীণরা আমাদের পরিবারের জীবন্ত ইতিহাস ও ভবিষ্যতের ভিত্তি। তাদের সম্মান, নিরাপত্তা ও স্নেহময় জীবন নিশ্চিত করা সমাজের মৌলিক দায়িত্ব। আমাদের উচিত প্রবীণদের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করে পরিবারকে এক নিরাপদ ও উষ্ণ আশ্রয়ে পরিণত করা, যেখানে তারা ভালোবাসায় ঘেরা থাকবে-আইনের নয়, মানবিকতার স্পর্শে নিরাপদ। সমাজ বদলায় মানুষের চিন্তা ও মানসিকতার মাধ্যমে। আসুন, আমরা সবাই মিলে এমন একটি মানবিক সমাজ গড়ি, যেখানে বয়স হবে শ্রদ্ধার কারণ, অবহেলার নয়, আর পরিবার হবে শক্তিশালী বন্ধনের পাথেয়।

References :

Parsons, T. (1951). The Social System. Glencoe: Free Press.

Durkheim, E. (1897). Suicide: A Study in Sociology. New York: The Free Press.

Government of Bangladesh. (2013). National Policy on Older Persons. Ministry of Social Welfare.

Institute of Social Welfare and Research, University of Dhaka. (2017). A Study on Elderly People in Old Age Homes in Bangladesh.

World Health Organization (WHO). (2015). Global Age-friendly Cities: A Guide.

ব্যাকবেঞ্চার

হেলাল উদ্দীন
শাখা কর্মকর্তা, উপাচার্যের সচিবালয়

ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র তাহসিন সবসময়ই শেষ বেঞ্চে বসে। কেউ বলে, সে নাকি অলস; কেউ বলে, ভদ্র লাজুক ছেলে। আসলে তার ভেতরে এক ধরণের জড়তা কাজ করে, 'আমি কি পারব? সামনে গিয়ে কথা বলতে? ভুল করলে হাসবে না সবাই?'। এইসব প্রশ্ন করে নিজেকে ছোট করে ফেলে সে।

ক্যাম্পাসের দিন কাটে নানা ছন্দে। ভিন্তা ক্যাফেটেরিয়ার কাচঘেরা জানালায় বিকেলের রোদ এসে পড়ে; ভেতরে ফিসফাস আড্ডা, বাইরে ছাত্রছাত্রীদের ছোটাছুটি। আরেক পাশে বিইউপি-এর লেকের উপর মনপুরা ব্রিজ; সন্ধ্যার বাতাসে ব্রিজের রেলিংয়ে হাত রেখে দাঁড়ালে মনে হয়-সমগ্র শহরের শব্দ হঠাৎ থেমে গেছে। লেকের ধারে থার্ডপ্লেস; খোলা হাওয়ার ক্যান্টিন, যেখানে আড্ডা জমে, কারও গিটার বাজে, কেউ নোট নিয়ে প্রেজেন্টেশনের খসড়া ঠিক করে। তাহসিনও মাঝে মাঝে থার্ডপ্লেসে বসে, কিন্তু নিজের কথা বলার সাহসটা জুটে না।

তাহসিনের ক্লাসমেট নাজিয়া, সে সামনের সারির ছাত্রী। প্রশ্ন করে, বিতর্ক করে, পড়ালেখাকে বাস্তবের কাজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চর্চা করে। ওকে দেখে তাহসিনের ভালো লাগে; ভালো লাগার ভেতর একটু ঈর্ষাও মেশে, 'আমি কেন পারি না?' নাজিয়া তাহসিনের দিকে হাসলে সে মাথা নুইয়ে বলে, 'হুম, ঠিক আছে,' তারপর কথাটা সেখানেই থেমে যায়।

এক রবিবার, গ্রুপ স্টাডির পর তাহসিন বেরিয়ে গেল দিয়াবাড়ি লেকের ধারে; সন্ধ্যা নামছে, লেকের জলে আলো পড়েছে। হঠাৎ সে দেখে, বেঞ্চে বসে কেউ স্কেচ আঁকছে। কাছে গিয়ে বোঝা গেল-নাজিয়া। কাগজে লেক, গাছ, আর দূরের ছায়া-ভাঙা আলো। নাজিয়া তাকিয়ে হেসে উঠল, 'এই সময় লেক দেখার আলাদা মজা আছে, তাই না?' তাহসিন বলল, 'তুমি স্কেচ করো নাকি?' নাজিয়া বলল, 'ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ পড়ি ঠিকই, কিন্তু ছবি আঁকা আমাকে মানুষের গল্প শোনার আরেকটা কান বানিয়ে দেয়।'

দুজন পাশাপাশি হাঁটল কিছুক্ষণ। বাতাসে শীতলতা, লেকের জল নরম শব্দ করছে। তাহসিন থমকে বলল, 'আমি একটা কথা বলি? ক্লাসে কথা বলতে ভয় লাগে। মনে হয় ভুল বলব, সবাই হাসবে।' নাজিয়া চুপ করে শুনল। তারপর ধীরে বলল, 'তাহসিন, ভয় পালায় না; কিন্তু ভয়কে নিয়ে হাঁটা শিখতে হয়। তুমি তো ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ পড়ো, এখানে প্রশ্ন না-করলে কিছুই এগোয় না। তাছাড়া, তুমি যা ভাবো সেটাই তোমার শক্তি। তোমার ভাবনাগুলো কাউকে-না-কাউকে তো শোনাতেই হবে।'

আলো বদলে গেল, আকাশ রাঙা হলো। যাওয়ার আগে নাজিয়া বলল, 'আগামী সপ্তাহে বিজয় অডিটরিয়ামে 'From Campus to Community: Youth-led Development' সেমিনার। তোমার একটা আইডিয়া নিশ্চয়ই আছে। জমা দাও।' তাহসিন হেসে বলল, 'আইডিয়া আছে; সাহসটাই কম।' নাজিয়া মৃদু হেসে উত্তর দিল, 'সাহস ধার দেওয়া যায়। চাইলে আমারটা নাও।'

পরদিন ডিপার্টমেন্টে ঘোষণা টাঙানো হলো–সেমিনারের জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রেজেন্টেশন আহ্বান। তাহসিন দিনের শেষে থার্ডপ্লেসে বসে কফির কাপ ঠোঁটে নিয়ে চিন্তা করে, কী বলবো আমি? তার মাথায় ঘুরতে থাকে একগুচ্ছ দৃশ্য–দিয়াবাড়ি লেকের ধারে সন্ধ্যার ভিড়, রাস্তার পাশে ছোট দোকান, ভুলপড়ুয়া বাচ্চাদের অভিভাবক, কাজের মেয়েদের ফেরার হাঁটা, গাড়ির লাইনে যারা বিক্রি করে মাস্ক বা ফুল। সে কল্পনায় একটা ফিল্ড ল্যাব বানায়–বিইউপির ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক আর আশেপাশের কমিউনিটি মিলে। নাম দেয়, 'চলমান শেখা', যার লক্ষ্য - ক্লাসরুমের তত্ত্বকে মাঠের বাস্তবতায় নেমে পরীক্ষা করা।

রাত নামার পর তাহসিন গেল মনপুরা ব্রিজে। ব্রিজের বাতি জ্বলছে, লেকের জলে তার প্রতিচ্ছবি। সে ল্যাপটপ খুলে স্লাইড বানাতে থাকে–সমস্যা নির্ধারণ → প্রমাণ সংগ্রহ → সমাধানের নকশা → ক্ষুদ্র পাইলট → মূল্যায়ন → নীতিগত বার্তা। প্রতিটি ধাপের পাশে লিখে: 'শুধু স্বেচ্ছাশ্রম না, ডেটা-চালিত তরুণ নেতৃত্ব।' সে প্রস্তাব করছে তিনটি ছোট পাইলট–

১. মহিলা শিক্ষার্থীদের নিরাপদ যাতায়াতের ম্যাপিং: রাতের পথে আলোর ঘনত্ব, জনসমাগম, পুলিশের প্যাট্রোল, সবকিছু নিয়ে ওপেন ম্যাপ ডেটা, এবং ক্যাম্পাসবাসের স্টপেজ অপ্টিমাইজেশন।
২. দিয়াবাড়ী লেক ও আশপাশে বজ্য চক্রাকার অর্থ নীতি: দোকানিদের সঙ্গে চুক্তি করে প্লাস্টিক আলাদা করা, ছাত্র-উদ্যোক্তাদের মাইক্রো-গ্রান্ট দিয়ে রিসাইক্লেল স্টার্টআপ-শিখছি, উপার্জনও করছি।
৩. প্রথম-প্রজন্ম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য মেন্টরিং : সিনিয়র-জুনিয়র ম্যাচিং, সাপ্তাহিক থার্ডপ্লেস হ্যান্ডল, মানসিক স্বাস্থ্য রেফারেল, পরীক্ষার আগে 'নিরাপদ স্থান' সেশন।

পরের সন্ধ্যায় তাহসিন আবার গেল দিয়াবাড়ি লেকে ওদিকে। নাজিয়াও ছিল। আজ নাজিয়া কথা কম বলছে; আকাশে আধো চাঁদ। তাহসিন এক নিশ্বাসে নিজের আইডিয়াগুলো বলল। শেষে যোগ করল, 'আমরা যদি সত্যি ডেভেলপমেন্ট পড়ি, তবে কাজটা হতে হবে সামাজিক উদ্যোগ আর জননীতি-দুটোর মাঝখানে। আমরা পোস্টার ঝুলিয়ে থামতে পারি না; আমাদের মাপতে হবে-কী বদলাল।' নাজিয়া চুপচাপ শুনে বলল, 'এই তো ম্যাচিউরড ভাবনা; একটা কথা যোগ করো–নৈতিকতা আর ন্যায়বোধ, যেটা না থাকলে কোনো উন্নয়নই উন্নয়ন থাকে না।

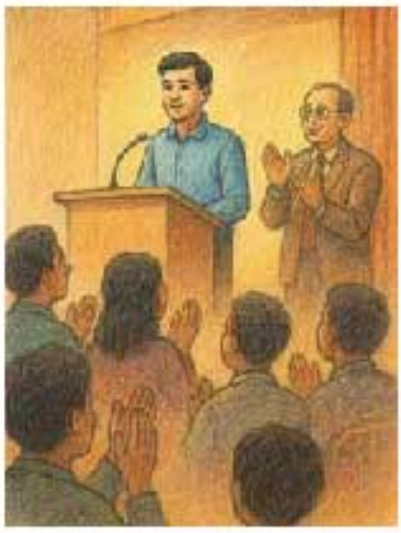

সেমিনারের আগের দিন তারা দুজন আপার প্লাজাতে বসে প্রেজেন্টেশন রিহার্সাল করল। নাজিয়া স্লাইড বদলাতে বলল, 'লেক পরিষ্কার করা ভালো উদ্যোগ, কিন্তু স্কুল-লেভেলের কথা। তুমি দেখাও, কীভাবে ডিজাইন থিংকিং আর ইমপ্যাক্ট ইভ্যালুয়েশন দিয়ে ছোট প্রকল্পকে পলিসি পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়।' তাহসিন একটি স্লাইডে লিখল : 'থার্ডপ্লেস পলিসি ডায়ালগ'-প্রতি শনিবার ছোট নীতিগল্প (পলিসি ডায়লগ); কিউআর কোড স্ক্যান করলে পড়া যাবে ছাত্রদের লেখা দুই পাতার ব্রিফ। একাডেমিত বিল্ডিংয়ে পোস্টার, 'আজকের প্রশ্ন : ফান্ডিং ছাড়া ফিল্ডওয়ার্কের সফলতা কীভাবে রক্ষা করব?' নাজিয়া হাততালি দিল, 'এটাই বিইউপি-খোলা বাতাসে শেখা, খোলা মনে বলা।'

সেমিনারের দিন, বিজয় অডিটরিয়াম ভরা। শিক্ষক, কর্মকর্তা, অতিথি, সিনিয়র অ্যালামনাই-সবার কোলাহল। নাজিয়া তার প্রেজেন্টেশনে শহুরে দারিদ্র্য ও লিঙ্গ-সংবেদনশীল বাজেটের কথা বলল। করতালি উঠল। তারপর মাইকে নাম ডাকা হলো–'তাহসিন মাহমুদ, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ।' ব্যাকবেঞ্চার ছেলেটি ধীর পায়ে উঠে গেল মঞ্চে। প্রথম মিনিটে হাত কাঁপছিল। পরের মিনিটে কণ্ঠ শক্ত হলো।

সে বলল, 'আমরা তরুণরা শুধু ডিগ্রি নিতে আসিনি। আমরা পলিসির ভাষা শিখতে এসেছি, যেন প্রমাণ দিয়ে কথা বলতে পারি, সহানুভূতি দিয়ে শুনতে পারি, আর দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করতে পারি। আমাদের প্রস্তাব, বিইউপিতে একটি 'স্টুডেন্ট-রান ফিল্ড ল্যাব' থাকবে। যেখানে গবেষণার প্রশ্ন আসবে আশপাশের মানুষের জীবন থেকে, আর উত্তরের খসড়া ফেরত যাবে তাদের হাতেই। তিনটি পাইলট প্রস্তাব করছি - নিরাপদ যাতায়াত ম্যাপিং, বজ্যের চক্রাকার অর্থনীতিতে ছাত্রউদ্যোগ, আর প্রথম-প্রজন্ম শিক্ষার্থীদের মেন্টরিং। আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয় হোক 'প্র্যাকটিসিং থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক, থার্ডপ্লেসের আড্ডা থেকে জননীতি-সংলাপ, মনপুরা ব্রিজের পোস্টার থেকে গবেষণা-ব্রিফ, দিয়াবাড়ি লেকের গল্প থেকে ডেটা-ড্যাশবোর্ড।'

করতালিতে মুখরিত হলো অডিটরিয়াম। এক শিক্ষক দাঁড়িয়ে বললেন, 'তরুণদের ভাবনা যখন যুক্তি আর মূল্যবোধে ভর করে, তখনই তা হয়ে ওঠতে পারে কল্যানকর জননীতি। তাহসিন, তুমি আজ তোমার ভয়কে সাহসে রূপ দিয়েছ। আমরা তোমাকে নিয়ে গর্বিত'। আয়োজকেরা ঘোষণা করল–'বেস্ট আইডিয়া: তাহসিন মাহমুদ এবং ডিপার্টমেন্ট তার একটি পাইলট প্রোজেক্টে ফান্ডিং করবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় আবারও দেখা নাজিয়ার সাথে তাহসিনের। দুজন হাঁটতে হাঁটতে গেল দিয়াবাড়ি লেকের ধারে; বাতাসে শীতলতা, দূরে লাইট বোট ভাসছে। তাহসিন থেমে বলল, 'ধন্যবাদ তোমাকে। তুমি না থাকলে হয়তো আমি নামই দিতাম না।' নাজিয়া চোখ মেলে তাকাল, 'আমরা তো একটা টিম। একা হেঁটে ডেভেলপমেন্ট হয় না। ভালো লাগা, ভয়, প্রশ্ন, সব মিলে একটা টিম।' একটু নীরবতা। তারপর তাহসিন দ্বিধা ভেঙে বলল, 'তোমার সঙ্গে থাকার সময়টা... কেমন যেন সাহস হয়ে ওঠে।' নাজিয়ার ঠোঁটের কোণে হাসি, 'সাহস কি আলাদা কিছু? দুটো হাত পাশাপাশি থাকলে যেটা হয়, সেটাকেই তো সাহস বলে।'

ওরা বসে পড়ল বেঞ্চে। লেকের ঢেউ গায়ে এসে লাগছে, দূরে কোনো বাচ্চা হেসে উঠল। তাহসিন বলল, 'জানো, আজ আরেকটা বিষয় বুঝেছি–আমরা যদি সত্যি সমাজ বদলাতে চাই, আগে নিজের ভেতরের ভয় আর অলসতা বদলাতে হয়। নাহলে সব কাগজেই থেকে যায়।' নাজিয়া বলল, 'চলো, আজকে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকি।' তারা গেল মনপুরা ব্রিজে। নিচে পানি, ওপরে আকাশ ভরা সোনালি আলো। তাহসিন বলল, 'আমি আজ শেষ বেঞ্চটা ছেড়ে দিয়েছি।' নাজিয়া উত্তর দিল, 'শেষ বেঞ্চ তোমারই থাকবে-যেদিন সামনে থাকার অহংকার বাড়বে, সেদিন শেষ বেঞ্চের বিনয়টা মনে করিয়ে দেবে।' তাহসিন মৃদু হেসে বলল, 'তাহলে শেষ বেঞ্চ থেকে শেখা, সামনে থেকে বলা-দুটোই থাকবে।' নাজিয়া তার হাত ছুঁয়ে বলল, 'আর পাশে থাকার কাজটা? সেটা আমার।' তারা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, বাতাসে তাদের নীরবতা ভেসে গেল দূরে।

সেমিস্টার শেষে ফিডব্যাকে শিক্ষকরা লিখলেন, 'ক্লাসের থিওরি যখন মানুষের গল্পে মিশে যায়, তখন সেটাই হয়ে ওঠে শিক্ষা, তখনই বিশ্ববিদ্যালয় হয় সফল।' তাহসিন নিজের ডায়েরিতে শেষ লাইনটা লিখল-'জয় মানে স্টেজে পুরস্কার নয়; জয় মানে ভয় পেরিয়ে একধাপ এগোনো, আর শেখাকে মানুষের কাছে ফেরত দেওয়া।'

পরদিনও সূর্য উঠবে, ভিন্সা ক্যাফেতে কফি ফুটবে, থার্ডপ্লেসে আড্ডা জমবে, মনপুরা ব্রিজে বাতি জ্বলবে, দিয়াবাড়ি লেকের জলে আলো দুলবে। আর ব্যাকবেঞ্চের কোনো এক শিক্ষার্থী হয়তো প্রথমবারের মতো হাত তুলবে, বলবে–'স্যার, একটা প্রশ্ন আছে।' সেই প্রশ্ন থেকেই শুরু হবে নতুন পথ, নতুন সাহস, নতুন গল্প।

অনেকে আহাজারি করতে করতে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলতে লাগল। পাশের বাসার এক দাদি আপসোস করছে আর বলছে আজিজ চিনির খুব আদরের নাতি ছিল। মরার সময় শেষ দেখাটাও দেখতে পেল না। আসলে এমনে হয় খুব বেশি আদর ও ভালোবাসার মানুষ বিপদের সময় এবং অন্তিম মুহূর্তে পাশে পাওয়া যায় না। দুনিয়ার মাইর বোঝা যায় না। সব আল্লাহ পাকের ইচ্ছা। আল্লাহ যা ভালো মনে করেন তাই হয়। আল্লাহ যেন চিনির কবরের আযাব মাফ করে দেন।

ট্রেন তার গন্তব্যে ছুটছে। ফজরের আজানের বেশ কিছুক্ষণ পরেই একটা কণ্ঠস্বর বেজে উঠল আ. আজিজের কানে। 'সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পার্বতীপুর রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে যাব। পার্বতীপুর রেলওয়ে স্টেশনে অবতরণকারী যাত্রীগণ দয়া করে আপনাদের মালামাল বুঝে নিন। কিছু ফেলে গেলেন কি না! দেখে নিন। গাড়ি সম্পূর্ণ থেমে যাওয়ার পর, সতর্কতার সাথে নামুন। নিরাপত্তার খাতিরে চলাচলের জন্য কেবলমাত্র প্লাটফর্ম অথবা ওভারব্রিজ ব্যবহার করুন। যেখানেই থাকুন নিরাপদ ও সুস্থ থাকুন। বাংলাদেশ রেলওয়েতে ভ্রমণের জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

ঘুম ভেঙে গেল আ. আজিজের। বুকের ভিতর থেকে হু হু শব্দে কান্না বের হচ্ছে। কোনোভাবেই কান্না থামাতে পারছে না। এমন একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে, তাৎক্ষণিক মনটা অস্থির হয়ে গেল। জানি না বাড়ির সবাই এখন কেমন আছে। বাস্তবে যদি তাই হয়ে থাকে। এমন জল্পনা, কল্পনার মধ্যে অস্থির হয়ে উঠল আ. আজিজ। রেল স্টেশন থেকে বের হয়ে কোথাও কালক্ষেপণ না করে সোজা বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল। বাড়িতে এসে প্রথমে তার দাদিকে দেখতে পেল। আবেগে আপ্লুত হয়ে চিনি বেগমকে জড়িয়ে ধরলো আ. আজিজ। আর বলতে লাগল কতদিন তোমাকে দেখি না। তোমার কথা খুব বেশি মনে পড়ে। আজকের আসাটা হয়তো তোমার টানেই। ..... আসলে বাস্তব বড় কঠিন জিনিস, মানুষের জীবনে এমনও ঘটে; যেখানে স্বপ্ন ও বাস্তব বিষয়টা একে-অপরের মুখোমুখি.....

ক্যাম্পাস থেকে কর্পোরেট : পেশাগত জীবনের ভিত্তি গড়া

শেখ মোঃ অনিক হাসান রাব্বি
প্রভাষক
ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ

গ্র্যাজুয়েশনের পর আপনার স্বপ্নের কোম্পানির ইন্টারভিউ বোর্ডে বসে আছেন। আপনাকে প্রশ্ন করা হলো, 'আপনার সিজিপিএ তো বেশ ভালো, কিন্তু ক্লাসরুমের বাইরে এমন কী করেছেন যা আপনাকে বাকিদের চেয়ে আলাদা করে তুলবে?' এই একটি প্রশ্নের সামনে এসে থমকে যায় হাজারো মেধাবী শিক্ষার্থী। কারণ, আজকের পৃথিবী শুধু পুথিগত বিদ্যায় সন্তুষ্ট নয়, চায় বাস্তব অভিজ্ঞতা আর হাতে-কলমে শেখা নেতৃত্বের প্রমাণ।

আর সেই নেতৃত্বে বসার প্রথম সুযোগটিই করে দেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবগুলো। এগুলো শুধু সিভি ভারি করার জায়গা নয়; এগুলো হলো আপনার ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের 'ফ্লাইট সিমুলেটর', যেখানে আপনি নিরাপদে উড়তে শিখবেন, ভুল করবেন এবং ঝড়ের মোকাবিলা করে একজন দক্ষ পাইলট হয়ে উঠবেন।

কেন ক্লাব নেতৃত্ব বিকাশের এক প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্ম?

ক্যাম্পাসে নেতৃত্ব বিকাশের কথা উঠলেই অনেকে ছাত্র রাজনীতির কথা ভাবেন। কিন্তু সত্যিটা হলো, আজকের কর্পোরেট দুনিয়া যে ধরনের যোগাযোগ দক্ষতা, টিমওয়ার্ক এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের খোঁজ করে, তার সঙ্গে প্রচলিত ছাত্র রাজনীতির কাঠামোগত পার্থক্য রয়েছে। এখানেই ক্লাবগুলো সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। একটি ক্লাব যেন একটি মিনি কর্পোরেট হাউজ, যেখানে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিভাগে কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে।

মজার ব্যাপার হলো, কোনো কর্পোরেট চাকরিতে ঢুকে প্রথমবার যে দায়িত্বগুলো পেলে ভয় বা চাপ কাজ করে, ক্লাবে কাজ করার মাধ্যমে সেই ভয়টা অনেকটাই কেটে যায়।

নেটওয়ার্কিং এবং কর্পোরেট সংযোগ : আপনার ভবিষ্যতের চাবিকাঠি

ক্লাব করার অন্যতম বড় সুবিধা হলো নেটওয়ার্কিং (Networking)। ক্লাবগুলোতে বিভিন্ন বিভাগের এবং বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীদের সাথে কাজ করতে গিয়ে দারুণ একটি যোগাযোগ বলয় তৈরি হয়। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগটি আসে যখন কোনো ইভেন্টের জন্য স্পনসর ম্যানেজ করতে হয়।

একবার ভাবুন, একজন দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী হিসেবে আপনি হয়তো কোনো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির ব্র্যান্ড ম্যানেজারের কাছে নিজের ইভেন্টের আইডিয়া পিচ করছেন। এই অভিজ্ঞতা আপনাকে শুধু আত্মবিশ্বাসীই করে তুলবে না, বরং ছাত্রাবস্থাতেই কর্পোরেট জগতের সাথে আপনার একটি সরাসরি সংযোগ তৈরি করে দেবে। এই সংযোগগুলো ভবিষ্যতে ইন্টার্নশিপ বা চাকরির ক্ষেত্রে অভাবনীয় সুযোগের দরজা খুলে দিতে পারে। আপনার হয়তো জানা নেই, অনেক কোম্পানির এইচআর (HR) ম্যানেজাররা প্রায়ই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবগুলোর বড় ইভেন্টগুলোতে নজর রাখেন ভবিষ্যতের ট্যালেন্ট খুঁজে বের করার জন্য।

ক্লাবে যোগদানের প্রক্রিয়া : আপনার প্রথম পেশাদার মহড়া

নতুন শিক্ষার্থীদের মনে প্রায়ই প্রশ্ন জাগে, 'এত এত ক্লাবের মধ্যে আমি পছন্দের ক্লাবে ঢুকব কীভাবে?' প্রতিটি ক্লাবের সদস্য

বাছাই করার প্রক্রিয়া ভিন্ন হলেও, বেশিরভাগ ভালো ক্লাবগুলো কিছু পেশাদার ধাপ অনুসরণ করে। সাধারণত তিনটি ধাপ থাকে :

১. **আবেদনপত্র :** প্রথমেই একটি সিভি-সহ অথবা সাধারণ আবেদনপত্রের মাধ্যমে আবেদন করতে হয়।
২. **কেস সলভিং বা গ্রুপ ডিসকাশন :** এই ধাপে আপনাকে একটি কাল্পনিক সমস্যা দিয়ে তার সমাধান করতে বলা হয়। এর মাধ্যমে আপনার সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ও চাপের মধ্যে কাজ করার ক্ষমতা যাচাই করা হয়।
৩. **চূড়ান্ত সাক্ষাৎকার :** সবশেষে একটি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আপনার আগ্রহ, ক্লাবের প্রতি আপনার ভাবনা এবং আপনার ব্যক্তিত্ব যাচাই করা হয়।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার কী জানেন? যেকোনো ভালো কোম্পানিতে চাকরির জন্য আবেদন করলে আপনাকে ঠিক এই ধাপগুলোই পার করতে হবে! সুতরাং ক্লাবে যোগ দেওয়ার এই প্রক্রিয়াটি আসলে চাকরির সাক্ষাৎকারের একটি নিখুঁত মহড়া, যা আপনাকে চাকরিতে প্রবেশের অনেক আগেই অভিজ্ঞ করে তোলে।

অগ্রাধিকারের তালিকা : পড়াশোনা আগে নাকি ক্লাব?

শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অগ্রাধিকার তালিকা থাকা উচিত। সেই তালিকার শীর্ষে থাকবে পড়াশোনা, তারপর গবেষণা ও নতুন কিছু উদ্ভাবনের চেষ্টা, এবং তারপর আসবে সফট স্কিলস অর্জন ও সাংগঠনিক জ্ঞানের জন্য ক্লাবে কাজ করা। ক্লাবের কাজে অতিরিক্ত সময় দিয়ে পড়াশোনার ক্ষতি করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ভারসাম্যটাই এখানে মূলমন্ত্র। দিনের শেষে আপনার সিজিপিএ (CGPA) আপনার অ্যাকাডেমিক নিষ্ঠার পরিচয় দেবে, আর ক্লাবের অভিজ্ঞতা আপনার ব্যবহারিক দক্ষতার প্রমাণ দেবে। দুটো মিলেই আপনি একজন পরিপূর্ণ প্রার্থী হয়ে উঠবেন।

ক্লাবগুলোকে যে বিষয়গুলো লক্ষ রাখতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য দারুণ সুযোগ তৈরি করলেও, এদের কার্যকারিতা নিয়ে কিছু প্রশ্নও ওঠে। অনেক সময় ক্লাবগুলোতে স্বজনপ্রীতি লক্ষ করা যায়। এর ফলে ক্লাবের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। ক্লাবগুলোকে সত্যিকারের লিডারশিপ তৈরির ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলতে হলে কয়েকটি বিষয় নিশ্চিত করা জরুরি :

১. **স্বচ্ছতা (Transparency) :** সদস্য নির্বাচন থেকে শুরু করে দায়িত্ব বণ্টন এবং ফান্ডের ব্যবহারে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা থাকতে হবে।
২. **শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা :** ক্লাবের দৈনন্দিন কাজ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার শিক্ষার্থীদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। শিক্ষকরা শুধু মেন্টর বা মনিটরের ভূমিকায় থাকবেন। শিক্ষার্থীরা ভুল করবে, তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে সেই ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নেয়ার সুযোগ করে দিতে হবে।
৩. **যোগ্যতার মূল্যায়ন :** ব্যক্তিগত সম্পর্কের চেয়ে যোগ্যতা ও আগ্রহকে প্রাধান্য দিতে হবে, যাতে সবাই সমান সুযোগ পায়।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শুধু ডিগ্রি অর্জনের জন্য নয়, এটি নিজেকে আবিষ্কার করার এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার একটি সুবর্ণ সুযোগ। ক্লাস, পরীক্ষা, অ্যাসাইনমেন্টের পাশাপাশি কোনো ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হওয়া আপনাকে সেই সুযোগটাই করে দেয়।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের 'ফিউচার অফ জবস' রিপোর্ট অনুসারে, ২০২৫ সালের মধ্যে সমস্ত চাকরির ৫০%-ই হবে ক্রিটিক্যাল থিংকিং, সমস্যা সমাধান, সৃজনশীলতা এবং নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল যা ক্লাবের প্রজেক্টভিত্তিক কাজ থেকে সহজেই অর্জন করা যায়।

সুতরাং, আপনার আগ্রহের সঙ্গে মেলে এমন একটি ক্লাব বেছে নিন। শুধু সদস্য হয়েই থাকবেন না, সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ুন। কারণ, আপনার সিজিপিএ বলবে আপনি কী পড়েছেন, কিন্তু আপনার ক্লাবের অভিজ্ঞতা বলবে আপনি বাস্তব জীবনে কী করতে পারেন। আর আজকের প্রতিযোগিতাময় দুনিয়ায়, 'আপনি কী করতে পারেন' তার মূল্যই হবে সবচেয়ে বেশি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবট অধিকার : নৈতিকতা, আইনি কাঠামো ও বিতর্ক

মাশিহা তাবাসসুম
সহকারী প্রভাষক
ডিপার্টমেন্ট অব মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং রোবোটিক্স এখন আর কেবল বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির বিষয় নয়। ChatGPT-এর মতো জেনারেটিভ এআই, Boston Dynamics-এর হিউম্যানয়েড রোবট, কিংবা সোফিয়া The Robot-এর মতো নাগরিকত্বপ্রাপ্ত যন্ত্র আমাদের ভাবাচ্ছে, এই সত্ত্বাগুলো কি কেবল যান্ত্রিক হাতিয়ার, নাকি তাদের কোনো নৈতিক বা আইনগত অধিকার থাকা উচিত? এই বিতর্ক আমাদের সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ও সামাজিক প্রশ্নে পরিণত হয়েছে (Coeckelbergh, ২০২০)।

ফটো ক্রেডিট : The Council of Europe

রোবট অধিকার কেন আলোচনায়?

রোবট ও এআই সিস্টেমগুলো এখন কেবল তথ্য প্রক্রিয়াকরণ বা ম্যানুয়াল কাজেই সীমাবদ্ধ নয়; তারা সৃজনশীল লেখা তৈরি করছে, চিকিৎসা সিদ্ধান্তে সাহায্য করছে, এমনকি মানুষের সঙ্গে আবেগিক সম্পর্কও তৈরি করছে। উদাহরণস্বরূপ, Replika নামক এআই চ্যাটবট অনেকের কাছে বন্ধুত্ব বা সঙ্গীর জায়গা নিয়েছে (Turkle, ২০১৭)।

২০১৭ সালে সৌদি আরব সোফিয়া নামক হিউম্যানয়েড রোবটকে নাগরিকত্ব দিয়েছে, যা বিশ্বজুড়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন-যদি মানবাধিকার এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি, তখন কীভাবে একটি রোবট নাগরিকত্ব পেতে পারে? (Sharkey, ২০১৮; জরহর, ২০২৩)। সোফিয়া-এর এই ঘটনা রোবট অধিকার নিয়ে বাস্তব ও কার্যকর আলোচনার পথ খুলেছে।

What is Robot Rights? (রোবট অধিকার কী)

রোবট অধিকার বলতে বোঝানো হয়, এমন নৈতিক ও আইনি কাঠামো যা উন্নত রোবট ও এআই সিস্টেমের আচরণ, ব্যবহার এবং দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করে।

- **নৈতিক দিক :** রোবটকে এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে মানব এবং প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা বা অবমাননা না ঘটে (Darling, ২০১৬)।
- **আইনি দিক :** রোবট বা এআই যদি কোনো ক্ষতি বা ভুল করে, তার দায়ভার কে নেবে তা স্পষ্ট করা (Bryson et al., ২০১৭)।

- **সীমিত বা ফাংশনাল অধিকার :** সম্পত্তি (Property) হিসেবে কিছু অধিকার বা ডেটা মালিকানা, আইনি দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করা।
- **মানব অগ্রাধিকার নীতি :** রোবট অধিকার যেন মানবাধিকারের ক্ষতি না করে রোবট অধিকার নিয়ে বিতর্ক আসলে শুধুমাত্র রোবটদের জন্য নয়; এটি আমাদের নিজস্ব নৈতিকতা, প্রযুক্তির ব্যবহার ও ভবিষ্যতের সমাজ নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন তোলে।

অধিকার মানে কী : মানুষ বনাম যন্ত্র

মানুষ অধিকার পায় কারণ তারা চেতনাশীল (Consciousness) এবং নৈতিক এজেন্ট (Moral agents)। প্রাণীরাও কিছু অধিকার পায়, কারণ তারা ব্যথা ও কষ্ট অনুভব করতে পারে (Singer, ১৯৭৫) । রোবটদের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, তারা কি সত্যিকারের চেতনা বা অনুভূতি রাখে, নাকি কেবল অ্যালগরিদমিক প্রতিক্রিয়া (Algorithmic response)?

চেতনা নিয়ে চলমান এআই গবেষণা এখনো একমত নয়। কিছু গবেষক দাবি করেন, উন্নত ভাষা মডেলগুলিতে 'emergent consciousness' দেখা দিতে পারে (Floridi & Chiriatti, ২০২০)। অন্যদিকে সমালোচকরা মনে করেন এটি কেবল চেতনার অনুকরণ (Simulation of consciousness), আসল অনুভূতি নয়।

সোফিয়া : রোবটের মানবিক রূপ ও সাম্প্রতিক কার্যক্রম

সোফিয়া, হ্যানসন রোবোটিক্সের তৈরি বিশ্বের প্রথম রোবট নাগরিক, সম্প্রতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছে। ২০২৫ সালে গুরগাঁওয়ে Sznapse এআই Conclave-এ সোফিয়া তার বুদ্ধিমত্তা ও হাস্যরসাত্মক প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। ২০২৪ সালে জিম্বাবুয়ে উদ্ভাবনী মেলায় সে জলবায়ু পরিবর্তন, মাদকাসক্তি ও আইনের মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে এবং তরুণদের এআই ও STEM ক্ষেত্রে আগ্রহী হতে উৎসাহিত করেছে। এছাড়া, ২০২৫ সালে প্রকাশিত 'My Robot Shopia' ডকুমেন্টারিতে সোফিয়া-এর সৃষ্টির গল্প এবং তার মানবিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে সোফিয়া রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী রিশি সুনাককে অত্যাধুনিক রোবট হিসেবে বর্ণনা করেছে, যা প্রযুক্তি ও রাজনীতি নিয়ে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করেছে (The Sun, ২০২৫)। ২০১৭ সালে, সোফিয়া বাংলাদেশেও ভ্রমণ করেছে এবং এআই ও রোবটিক্সের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও নৈতিক ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছে, যা স্থানীয় শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং প্রযুক্তিপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। সোফিয়া-এর এই কার্যক্রম প্রমাণ করে, রোবট কেবল যন্ত্র নয়, তারা মানব সমাজে নৈতিক, আইনি ও সামাজিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে।

ফটো ক্রেডিট : The Sun

বাস্তব চ্যালেঞ্জ : আবেগ ও সম্পর্ক

মানুষ ইতোমধ্যে রোবটের সঙ্গে আবেগিক সম্পর্ক তৈরি করছে। জাপানে 'Lovot' শিশুদের আবেগীয় বিকাশে সাহায্য করছে, আবার বয়স্কদের জন্য 'Paro' নামক রোবট সিল সামাজিক সঙ্গী হিসেবে কার্যকর। এমন সম্পর্ক মানবিক অনুভূতি ও একাকিত্ব কমাতে সহায়তা করে (Broadbent et al., ২০০৯)।

কিন্তু প্রশ্ন রয়ে যায়, যদি মানুষ একটি যন্ত্রের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক তৈরি করে, তখন সেই যন্ত্রকে সম্পূর্ণ অধিকারহীন রাখা কি নৈতিক?

আইনি বিতর্ক : রোবট কি নাগরিক হতে পারে?

ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ২০১৭ সালে 'electronic personhood' ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছিল, যেখানে উন্নত এআই-কে সীমিত আইনি মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব ছিল। তবে ২০২৪ সালের এআই আইন (Regulation (EU) ২০২৪/১৬৮৯) অনুযায়ী, এআই-কে মানবের মতো আইনি ব্যক্তিত্ব দেওয়া হয়নি।

এখন আইন কী ফোকাস করছে :

- এআই বা রোবটকে 'Person' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না।
- দায়বদ্ধতা (Accountability) ও ঝুঁকির শ্রেণিবিন্যাস (Risk Classification) : এআই ব্যবহার বা ভুলের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও দায় নির্ধারণ করা হবে।
- এআই নির্মাতা, ব্যবহারকারী ও প্রতিষ্ঠান সক্রিয়ভাবে দায়বদ্ধ থাকবে, দুর্ঘটনা বা ক্ষতির সময় দায়ভার স্পষ্ট থাকবে (European Parliament, ২০২৪)।

ইউনেস্কো ২০২৩ সালে এআই নীতিশাস্ত্রের একটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করেছে। এতে বলা হয়েছে, এআই কখনো মানুষের সমতুল্য অধিকার পাবে না, তবে এর ব্যবহার যেন মানবাধিকারের ক্ষতি না-করে তা নিশ্চিত করতে হবে (UNESCO, ২০২৩)।

আগামীর দিকনির্দেশনা

ফাংশনাল অধিকার, নৈতিক বিবেচনা এবং মানব অগ্রাধিকার নীতি-আজকাল রোবট ও এআই ব্যবহারের নৈতিক ও আইনি আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। এই তিনটি দিকের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার কারণ হলো তারা প্রযুক্তি এবং মানব সমাজের মধ্যে সম্পর্ককে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে। উদাহরণস্বরূপ, উন্নত রোবট এবং এআই যখন মানুষের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনে অংশ নেবে, তখন শুধুমাত্র কার্যকারিতা নয়, বরং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা, নিরাপত্তা এবং নৈতিক দায়িত্বও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারকরা এখন এই বিষয়গুলো নিয়ে সূক্ষ্ম ভারসাম্য খুঁজছেন–কীভাবে প্রযুক্তিকে এগিয়ে নেওয়া যায়, আবার মানুষের নৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বজায় রাখা যায়। ফলে, এই তিনটি নীতি শুধু রোবটের ব্যবহার সীমিত করার উপায় নয়, বরং একটি নতুন নৈতিক ও আইনি মানদণ্ড স্থাপনের প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা যায়।

উপসংহার

রোবট অধিকার নিয়ে বিতর্ক কেবল রোবটদের নিয়ে নয়; এটি আমাদের নিজের নৈতিকতা, মানবতা এবং ভবিষ্যতের সমাজ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। রোবট এবং এআই-এর সঙ্গে মানুষের সহঅস্তিত্ব–বা সহজভাবে বলা যায়, সহাবস্থান, এখন শুধুমাত্র ভবিষ্যতের কল্পনা নয়, বরং বাস্তব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যখন এই প্রযুক্তিগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গভীরভাবে প্রবেশ করছে, তখন প্রশ্ন জাগে, তারা কি শুধুমাত্র যন্ত্র, নাকি তাদেরও কিছু নৈতিক বা সীমিত অধিকার থাকা উচিত? রোবটের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং সামাজিক ব্যবহার দেখাচ্ছে যে কেবল কার্যকর প্রযুক্তি নয়, বরং একটি নতুন নৈতিক ও সামাজিক মানদণ্ডের প্রয়োজন রয়েছে। যে সিদ্ধান্তই আসুক না কেন, তা আমাদের সভ্যতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র :

- Coeckelbergh, M. (2020). *AI Ethics*. MIT Press.
- Turkle, S. (2017). *Replika: AI and the Future of Friendship*. MIT Press.
- Sharkey, N. (2018). *Shopia the Robot: A Critical Analysis*. Springer.
- Rini, R. (2023). *Robot Rights and Human Ethics*. Oxford University Press.
- Darling, K. (2016). *Robot Rights: The Ethical Implications of AI*. Cambridge University Press.
- Bryson, J. J., et al. (2017). *The Ethics of Autonomous Systems*. Springer.
- Floridi, L., & Chiriatti, M. (2020). *AI and Consciousness: A Philosophical Perspective*. Springer.
- European Parliament. (2024). *Regulation (EU) 2024/1689 on Artificial Intelligence*. Official Journal of the European Union.
- Broadbent, E., et al. (2009). *The Role of Robots in Human Society*. Springer.
- The Sun. (2025). 'Putin a War Criminal, Sunak a Robot?' *The Sun*.
- UNESCO. (2023). *AI Ethics Framework*.

চায়ের কাপে শিক্ষা!!!

মেহেদী ছাজিদ খান
শাখা কর্মকর্তা
পাবলিক রিলেশন্স, ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিকেশন্স

নিলয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র; জহুরুল হক হলে থাকে। প্রতিদিনের মতো টিএসসি-তে আড্ডা দিতে গিয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে চা, সিগারেট–সব মিলিয়ে দিনে খরচ গড়ে ৫০ টাকা। এই টাকাটা খুব সামান্য মনে হতো তার কাছে। একদিন এক বড়ভাই তাকে সিগারেট হাতে দেখে বলল, 'কিরে, সব টাকা তো ফুঁকেই উড়াই দিবি!' সিনিয়র ভাইয়ের কথা তার মনে দাগ কাটল! সে হিসাব কষে দেখল–তার এ খরচ মাসে ১,৫০০ টাকা, আর বছরে দাঁড়াচ্ছে প্রায় ১৮,০০০ টাকা!
সে ভাবল, এই টাকা দিয়ে সে কী করতে পারত? সেন্ট মার্টিনে বন্ধুদের সঙ্গে ভ্রমণ? নাকি বাবা-মাকে নতুন একটা মোবাইল ফোন উপহার? কিংবা হঠাৎ অসুস্থ হলে মেডিক্যাল খরচ মেটানোর জন্য আলাদা সঞ্চয়?
নিলয়ের চোখ খুলে গেল। সে বুঝল, টাকা জমানো মানে নিজেকে কোনোকিছু থেকে বঞ্চিত করা নয়, বরং সামান্য বুদ্ধিমত্তার অভ্যাস। সেদিন থেকেই সে সিদ্ধান্ত নিল, পুরোপুরি আড্ডা বাদ দেবে না, তবে সপ্তাহে তিনদিন খরচ বাদ দিয়ে সেই টাকা আলাদা করে রাখবে।

ছোট অভ্যাস, বড় পরিবর্তন!
প্রথমে কাজটা কঠিন মনে হয়েছিল। কিন্তু নিলয় মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপে একটি আলাদা 'সেভিংস ওয়ালেট' খুলল। প্রতিবার বাঁচানো টাকা সেখানে রাখত। ছয় মাস শেষে যখন দেখল তার হাতে জমেছে প্রায় ৯,০০০ টাকা, তখন বিশ্বাসই হচ্ছিল না।
এই টাকা দিয়েই বাবার জন্মদিনে একটি ঘড়ি কিনল নিলয়। ছোট্ট উপহার, কিন্তু বাবার চোখে জল এনে দিল। নিলয় বুঝল–সঞ্চয়ের আসল আনন্দ শুধু টাকা জমানো নয়, বরং ভালোবাসার মুহূর্ত তৈরি করা।

জরুরি সময়ে ভরসা!
শুধু উপহার নয়, সঞ্চয়ের প্রকৃত শক্তি টের পেল আরেকবার। কয়েক মাস পর হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলো নিলয়। তখন বন্ধু বা পরিবারের কারও কাছে হাত পাততে হয়নি, কারণ তার সঞ্চিত টাকাই চিকিৎসার খরচ মেটাল। এ অভিজ্ঞতা তাকে নতুন করে ভাবতে শেখাল-'আমার ছোট্ট অভ্যাসটাই আজ আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করল।'

কেন অভ্যাস ইচ্ছাশক্তির চেয়ে শক্তিশালী?
আমাদের অনেকেই হঠাৎ করে 'নো-স্পেন্ড মাস' বা 'কঠিন বাজেট' করার চেষ্টা করি। কিন্তু এসব খুব বেশিদিন টেকে না। কারণ এগুলো মনে হয় শাস্তির মতো। টেকসই সঞ্চয়ের জন্য দরকার অভ্যাস। ছোট ছোট কাজকে নিয়মে পরিণত করা।
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর কৌশল :

১. আগে সঞ্চয় করা
হাতে টাকা আসা মাত্র একটা নির্দিষ্ট অংশ আলাদা করে রাখো। স্টাইপেন্ড, টিউশনি বা ফ্রিল্যান্সিং-এর টাকা হাতে এলেই অন্তত ৫০০/১০০০ টাকা সরাসরি আলাদা অ্যাকাউন্টে জমা করা। খরচ করার পর নয়, খরচ শুরু করার আগেই সঞ্চয় করা।

২. মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার করা
বিকাশ, নগদ বা রকেটে আলাদা 'সেভিংস ওয়ালেট' খোলা যেতে পারে। সেখানে অটো-সেভ চালু করা। এতে করে সঞ্চয় হবে চুপচাপ, তোমার কোনো খেয়াল ছাড়াই।

৩. ২৪ ঘণ্টার নিয়ম মেনে চলা
নতুন হেডফোন, জুতো বা ব্যাগ কিনতে ইচ্ছে হলে সঙ্গে সঙ্গে না-কিনে ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করো। দেখা যাবে, বেশিরভাগ সময়েই আগ্রহটা মিলিয়ে গেছে।

৪. লক্ষ্যকে দৃশ্যমান করা
অ্যাকাউন্টের নাম দাও–'ভ্রমণ ফান্ড', 'বাবার জন্মদিনের গিফট' বা 'ইমার্জেন্সি সেভিংস'। যখন লক্ষ্য চোখের সামনে থাকে, তখন মন আরও শক্তি পায়।

৫. ছোট নোটের জাদু
প্রতিবার ২০ বা ৫০ টাকার নোট হাতে পেলে আলাদা করে রাখো। বছর শেষে সেই জমানো নোট দিয়েই হয়তো মায়ের জন্য কিনতে পারবে একটি সুন্দর শাড়ি বা যোগান হবে বন্ধুদের সাথে সেন্টমার্টিন ট্রিপের খরচ!

৬. আয় বাড়লে খরচ নয়, সঞ্চয় বাড়াও!
টিউশনি বা ফ্রিল্যান্স আয়ে বাড়তি টাকা পেলে অর্ধেকটা সঞ্চয়ে রাখো। এতে বাড়তি খরচের ফাঁদে পড়বে না, বরং ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হবে শক্ত ভিত।

বাংলাদেশের তরুণদের জীবন এখন অনেক ব্যস্ত ও প্রতিযোগিতামূলক। ক্লাস, কোচিং, পার্ট-টাইম কাজ–সব মিলিয়ে খরচও বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, জরুরি সময়ে বা হঠাৎ কোনো স্বপ্ন পূরণে আমাদের হাত খালি থাকে। সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুললে সেটাই হবে সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা। ভাবো তো–হঠাৎ বন্ধুর সঙ্গে সিলেট ভ্রমণে যেতে চাইছ, আর তোমার কাছে আগে থেকেই ৫,০০০ টাকা সঞ্চিত আছে। অথবা মা-বাবার জন্য ঈদে নতুন পোশাক কিনতে চাইছ, আর হাতে পর্যাপ্ত টাকা আছে। তখন বুঝবে–এই স্বাধীনতা কতটা দামি।

শেষকথা
আজ থেকেই আমরা এই ছোট অভ্যাসের শুরু করতে পারি। প্রতি সপ্তাহে মাত্র ২০০ টাকা আলাদা করে রাখলে বছর শেষে জমবে ১০,০০০ টাকার বেশি। সেই টাকায় একদিন হয়তো বন্ধুদের সঙ্গে কুয়াকাটা বা সাজেক ভ্রমণে যাওয়া যাবে, অথবা হঠাৎ অসুস্থ হলে নিজের খরচ নিজেই চালানো যাবে।
আমাদের মনে রাখতে হবে–সঞ্চয়ের অভ্যাস মানে শুধু টাকা জমানো নয়, বরং নিরাপত্তা, স্বাধীনতা আর ভালোবাসার মুহূর্তগুলো তৈরি করা।

ঘরে ফেরা কিংবা ঘরছাড়ার তাড়া

ফাহমিন চৌধুরী
প্রভাষক
ডিপার্টমেন্ট অব ল

শহরের অন্যতম গুরুত্বহীন একটি জায়গায় বিগত সাড়ে সাত মিনিট যাবৎ আমি শুকনো বিস্কিট চিবাচ্ছি, হাতে এক কাপ গরম থেকে ঠান্ডায় পরিণত হয়ে যাওয়া চা নিয়ে। এই সাড়ে সাত মিনিটে অদ্ভুত তিনটি ঘটনা ঘটেছে। প্রথমত, এলাকায় নব্য জুড়ে বসা পাগলটি আমাকে শুদ্ধ বাংলায় 'ভাই ঘড়িতে কয়টা বাজে?' টাইপ প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, এলাকার রহমত চাচা, যিনি পেশায় রিকশাওয়ালা এবং পরহেজগার মানুষ হিসেবেই পরিচিত, তিনি প্রথমবারের মতো সিগারেট ধরিয়ে ৩ মিনিট যাবৎ কাশতে কাশতে রিকশায় পুনরায় টান দিয়েছেন যাত্রী ছাড়াই। আর শেষটা হচ্ছে, হামিদ মামার চায়ের দোকানে আজকে মাত্রাতিরিক্ত ভিড় হয়েছে এবং এই ভিড়টা গত সাড়ে চার মিনিট আগে শুরু হলেও আজকে সহজে কমবে বলে মনে হয় না, কারণ এই ব্যাটারা অনবরত লোক ডেকেই যাচ্ছে চা খাওয়ার জন্য। খুব সম্ভবত তারা কোথাও ঘুরতে যাচ্ছে এবং যাত্রাপথে খানিক বিরতিতে চা-পান চলছে। এদিকে ধোয়াশা ঢাকা চুলার সামনে দাঁড়িয়ে আমি মহাপবিত্র বৃহস্পতিবারের জ্যামে বন্দি থাকা মানুষের বিরক্তিকর অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ দেখছি। দেখতে দেখতে চায়ে চুমুক দিয়ে বুঝলাম ঠান্ডা চা আসলেই খুব জঘন্য খেতে এবং সময়ে সময়ে সেটা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অশান্তির উদ্রেগ ঘটাতেও খুব একটা অপেক্ষা করে না। যাকগে, ঘড়িতে সময় দেখলাম, রাত ৯টা বেজে ৩৮মিনিট। অর্থাৎ আমি এখানে চা হাতে দাঁড়িয়ে আছি প্রায় নয় মিনিটের মতন। মাথাটা ঝিম ধরে আসছে, সারাদিনের ক্লান্তি ভর করতে চলেছে, তাপদাহে ক্লান্তির মাত্রাটা বেড়েছে।

ইদানীং এই জিনিসটা বেশ পীড়া দিচ্ছে। আজকাল আগের মতন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতেও পারি না। হুট করে কেমন যেন হাল ছেড়ে দেয় শরীর। চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে হবে। কিন্তু সরকারিতে যতটা মনোযোগ সহকারে দেখে তার চেয়ে বেশি মনোযোগ প্রাইভেটে গেলে পাওয়া যায়। তবে ডাক্তার সাহেব বেজায় ভালোমানুষী করে হাসিমুখে বলেছিলেন, সকালের ব্রেকফাস্ট করার অভ্যাস করতে হবে এবং চায়ের পরিমাণ কমাতে হবে। এটুকুর পর আর কী কী বলেছেন সেগুলো শোনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ কাজ করেনি। প্রেসক্রিপশন নিয়ে চলে এসেছি; ফার্মেসির সামনে দিয়ে গেলেও ওষুধ কেনার ইচ্ছা ওই চা ত্যাগের বাণী শোনামাত্রই চলে গিয়েছে।

চায়ের বিলটা দিয়ে বেরিয়ে আসার পথেই দেখলাম রহমত চাচা আবার দোকানমুখো হচ্ছেন। আমায় দেখে ডাক ছাড়ল-
-ভাইজ্জা, যাবানি বাড়িত? চল আউগায়া দিয়া আসি।
-চাচা হেটেই চলে যাব, এই তো দু মিনিটের পথ।
-আরে অহন কথা কইয়ো না। চলো আউগাইয়া যাই, শইলের যা হাল বানাইছো, তাতে আর হাটোন লাগত না, আহো..
-চলেন যাওয়া যাক।

সচরাচর রহমত চাচার রিকশায় আমি উঠি না। সম্পর্কে উনি আমার বড়চাচার স্কুলের বন্ধু হলেও এখন ঢাকা শহরে রিকশা চালাচ্ছেন এবং কাকতালীয়ভাবে আমার বর্তমান মেসের পাশের বস্তিতেই থাকছেন। আর্থিক অনটনে পড়ালেখাটা আর হাইস্কুলের দোরগোড়ায় যায়নি কিন্তু আত্মিক শিক্ষাটা কিংবা নৈতিকতাটা বংশপরম্পরায় ভালোভাবেই পেয়েছেন। তার স্কুলটিচার বাবা তাকে ঋণের জালে বন্দি করলেও এসব শিক্ষার ব্যাপারে উদারমনা ছিলেন। উনার রিকশায় উঠলে উনি ভাড়াটা নেন না দেখেই উনার রিকশা এড়িয়ে চলি। তবু আজ আর শরীর টানছে না। তাই 'না' করলাম না। বড়চাচা বলেছিলেন, রহমত চাচার গানের গলা নাকি বেশ সুন্দর। গলির মধ্যে ঢোকামাত্র যখন জ্যামের ছিটেফোঁটা আর দেখলাম না,তখনি চাচাকে বলে বসলাম-

-চাচা, একটা গান ধরেন!
- কোন গান হুনবার চাও?
-যেইডা আপনের মনে চায়।
-আইচ্ছা খাড়াও।
গলা খাকারি দিয়ে একটা আবেশ এনে একটু গভীর ভাব ধরে চাচা গলা ছেড়ে গান ধরলেন-

'হইয়া আমি দেশান্তরী
দেশ-বিদেশে ভিড়াই তরী রে
নোঙর ফেলি ঘাটে ঘাটে,
নোঙর ফেলি ঘাটে ঘাটে,
বন্দরে বন্দরে
আমার মনের নোঙর পইড়া রইছে হায়রে
সারেঙ বাড়ির ঘরে.....'

এটুকু গাইতেই বাসার সামনে হাজির। নেমে বাসার উদ্দেশ্যে হাঁটা দিলাম বিনা বাক্যব্যয় করে এবং চাচাও গাইতে গাইতে রওনা দিলেন। গান গাইছেন নাকি নিজের ঘরে ফেরার আকুতি প্রকাশ করছেন, সে তর্কে না হয় নাই-বা গেলাম। ধীরে ধীরে রহমত চাচার গলার আওয়াজ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ঘরে ফেরার তাড়নার ক্ষেত্রে রহমত চাচা এবং আমি একই কাতারে আছি বলা চলে। কিন্তু ওই যে টাকা, অর্থাভাব কিংবা নেহাৎই নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার ইচ্ছাশক্তিটাই এই তাড়নার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এককাপ চা খেতে ইচ্ছে করছে, তবে এবার আর ঠান্ডা নয়, গরম ধোয়া-ওঠা চা। এটা ছাড়া ঘুম আসবে না আজকে।

পুরুষতন্ত্রের অন্তরালে

জান্নাতুল ফেরদৌস ইতি
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব সোশিওলজি

সমাজ আসলে 'অভ্যাস'-এর আবর্তে বন্দি। চিকিৎসাবিজ্ঞান যখন অনাগত সন্তানের লিঙ্গ নির্ণয়ে সক্ষম তখন পরিবার অভ্যাসগতভাবেই জন্মের আগে থেকেই বৈষম্যের সৃষ্টি করে। যখন সন্তানটি পুত্র হিসেবে চিহ্নিত হয় তখন গর্ভধারিণী মা লাভ করে অধিক যত্ন, ভালোবাসা, এবং সম্মান। কারণ এই সন্তানই হবে পরিবারের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। সমাজবিজ্ঞানী টালকট পার্সনের 'Functionalist Perspective' অনুসারে পরিবার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যেখানে পুরুষের ভূমিকা 'Instrumental Role'—অর্থাৎ আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করা, আর নারীর ভূমিকা 'Expressive Role' অর্থাৎ পরিবারের আবেগিক বন্ধন রক্ষা ও সেবাযত্ন করা। বাংলাদেশের সমাজ এখনো এই লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা শক্তভাবে মেনে চলে। ফলে পুরুষের জন্য পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূরণ করা শুধু একটি দায়িত্ব নয়, বরং তা সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত একটি অপরিহার্য ভূমিকাও বটে। পিটার বার্জার ও থমাস লুকম্যান তাঁদের 'Social Construction of Reality' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে বাস্তবতা কোনো প্রাকৃতিক বা স্বতঃসিদ্ধ বিষয় নয়, বরং এটি মানুষের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, সংস্কৃতি, এবং সামাজিক কাঠামোর মাধ্যমে গড়ে ওঠে বা নির্মিত হয়। সমাজে পুরুষকে পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী (Breadwinner) হিসেবে দেখা হয় যা ছোটবেলা থেকেই সামাজিকীকরণের (Socialization) মাধ্যমে শিশুদের মনে গেঁথে দেওয়া হয়। 'পুরুষ মানেই সংসার চালাবে'-এটি আসলে একটি সামাজিকভাবে নির্মিত প্রত্যাশা। বার্জার ও লুকম্যানের ভাষায়, এটি একটি Institutionalized Role, যা এতদিন ধরে চলে আসছে তা এখন স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক বলে মনে হয়।

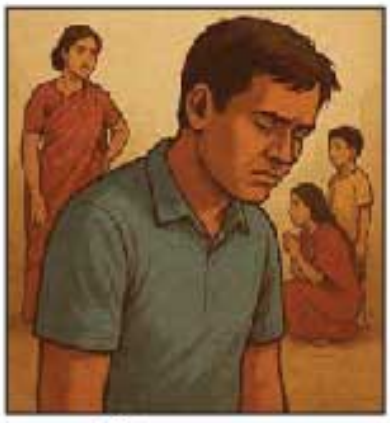

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে জীবনযাত্রার ব্যয় দিন দিন বেড়ে চলেছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, মূল্যস্ফীতি, বেকারত্ব, সীমিত আয়ের কর্মসংস্থান, এবং অস্থিতিশীল অর্থনীতি–সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন যেন এক অবিরাম সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ে পরিবারের উপার্জনক্ষম পুরুষ সদস্যের ওপর, যিনি পরিবারের প্রধান দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। সমাজে প্রচলিত লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা (Gender Role) অনুযায়ী পুরুষের ওপর আরোপিত 'উপার্জনকারী' বা breadwinner তকমা তাকে বাধ্য করছে একধরনের Self-denial বা আত্মবিসর্জনের চর্চা করতে। সংসারের অপরিহার্য চাহিদাগুলো পূরণ করতে গিয়ে তারা নিজেদের চাহিদাকে গৌণ করে ফেলছেন। জামাকাপড় কেনা, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ, শখ পূরণ, কিংবা সামান্য ব্যক্তিগত বিনোদনের ক্ষেত্রেও তারা পিছিয়ে পড়ছেন। সমাজতাত্ত্বিকভাবে এটি শুধুমাত্র ব্যক্তির ত্যাগ নয়, বরং একটি কাঠামোগত এবং সাংস্কৃতিক সমস্যার প্রতিফলন। মার্কসবাদী বিশ্লেষণে দেখা যায়, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামো শ্রমজীবী মানুষকে ক্রমাগত শোষণ করে। বাংলাদেশে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির পুরুষরা সীমিত বেতনের চাকরিতে কিংবা উপার্জনে নিয়োজিত থেকে বাজার অর্থনীতির চাপ সামাল দিতে গিয়ে নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তারা তাদের শ্রমশক্তি বিক্রি করে সংসার চালালেও নিজেদের জন্য 'সারপ্লাস ভ্যালু' উপভোগ করতে পারছেন না। অর্থাৎ, পরিবার বাঁচাতে গিয়ে পুরুষরা নিজেরাই এক ধরনের অদৃশ্য শোষণের শিকার হচ্ছেন। মার্টনের মতে, সমাজ মানুষকে কিছু সাংস্কৃতিক লক্ষ্য (Cultural Goals) নির্ধারণ করে দেয়; যেমন, ভালো খাওয়াদাওয়া, সন্তানকে শিক্ষিত করা, পরিবারের জন্য নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করা ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো অর্জনের বৈধ

উপায় যখন সীমিত থাকে, তখন মানুষ মানসিক চাপের মধ্যে পড়ে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পুরুষরা বৈধ উপায়ে আয় করে সংসারের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছেন, আর এই ব্যর্থতা তাদের ঠেলে দিচ্ছে ব্যক্তিগত চাহিদাকে ত্যাগ করার দিকে।

সমাজে প্রচলিত ধারণা হলো–একজন 'আদর্শ পুরুষ' মানেই সে মানসিকভাবে শক্তিশালী, দায়িত্বশীল, পরিশ্রমী এবং পরিবারকে আগলে রাখা ব্যক্তি। এই Hegemonic Masculinity পুরুষদের ওপর মানসিক ও সামাজিক চাপ সৃষ্টি করে, যাতে তারা নিজের কষ্ট প্রকাশ না করে নীরবে আত্মত্যাগকে 'পুরুষালি গুণ' হিসেবে মেনে নেন। ফলে তাদের ভোগান্তি দৃশ্যমান হয় না, বরং একধরনের অদৃশ্য সামাজিক শৃঙ্খল হিসেবে থেকে যায়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে পরিসংখ্যান বলছে, পুরুষদের গড় আয়ু নারীদের তুলনায় কয়েক বছর কম। এর পেছনে অনেকগুলো কাঠামোগত ও সামাজিক কারণ রয়েছে, যার একটি বড় কারণ হলো সংসারের চাহিদা পূরণের জন্য পুরুষ মানুষের অতিরিক্ত আত্মত্যাগ। প্রথমত, স্বাস্থ্য অবহেলা; পুরুষরা পরিবারের অন্য সদস্যদের চিকিৎসা খরচ মেটাতে গিয়ে নিজেদের অসুস্থতাকে অবহেলা করেন। দ্বিতীয়ত, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও পেশাগত ঝুঁকি; বাংলাদেশে অধিকাংশ পুরুষকে দীর্ঘসময় ধরে শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়, অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করতে হয়। সংসারের দায় মেটাতে গিয়ে বিশ্রামের সুযোগ পান না। এর ফলে হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ও স্ট্রোকের মতো রোগ দ্রুত গ্রাস করে। তৃতীয়ত, মানসিক চাপ–দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, সীমিত আয়, আর সংসারের ক্রমবর্ধমান খরচ মিলিয়ে পুরুষরা সবসময় একধরনের মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন। কিন্তু সমাজ তাদের শিখিয়েছে, পুরুষদের কাঁদতে নেই, দুঃখ বা কষ্ট প্রকাশ করা দুর্বলতা। ফলে নীরব মানসিক যন্ত্রণা শারীরিক অসুস্থতায় রূপ নেয়, যা আয়ুষ্কালকে আরও ছোট করে দেয়।

এই আত্মত্যাগ আমাদের সমাজে প্রায়শই অদৃশ্য থেকে যায়। পরিবার ধরে নেয়, বাবার সবসময়ই দায়িত্ব সংসারের ভার বইতে হবে। সন্তানরা ভাবে, বাবার কাজই হলো সবকিছু যোগান দেওয়া। স্ত্রী ভাবে, স্বামীর কর্তব্যই হলো সংসারের ভরণপোষণ নিশ্চিত করা। অথচ এ দায়িত্ব পালনের পেছনে যে কতগুলো বিসর্জন লুকিয়ে থাকে, তা খুব কম মানুষই খেয়াল করেন। এই নীরব আত্মত্যাগকে আমরা স্বাভাবিক ভেবে নিয়েছি, যেন এটি কোনো প্রশ্নের বিষয়ই নয়। অথচ এর ভেতরেই লুকিয়ে আছে এক নিঃশব্দ ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডি থেকে পুরুষ মানুষকে মুক্ত করতে হলে পরিবারকেই প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে। পরিবারের সদস্যদের উচিত খোলাখুলি কৃতজ্ঞতা জানানো, বাবার কিংবা স্বামীর অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া। শুধু অর্থ উপার্জন নয়, নিজের চাহিদাকে বিসর্জন দেওয়াও একধরনের অবদান। সংসারের দায়িত্ব ভাগাভাগি করা, স্ত্রী কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদেরও আর্থিক এবং সামাজিক দায়িত্বে অংশগ্রহণ করা–এসব উদ্যোগ পুরুষের চাপ অনেকটাই কমাতে পারে। পাশাপাশি বাবাকে নিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে উৎসাহ দেওয়া, তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া, কিংবা মাঝে মাঝে তার জন্য নতুন জামাকাপড় কেনা–এসব ছোট ছোট যত্ন তাকে মনে করিয়ে দেবে যে তার আত্মত্যাগ অবহেলিত নয়।

সমাজকেও এখানে দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। পুরুষ মানেই সবকিছু সহ্য করবে, পুরুষ মানেই সবকিছু সামলাবে – এই ধারণাকে এখনই পরিবর্তন করতে হবে। পুরুষও মানুষ, তারও দুর্বলতা আছে, তারও যত্নের প্রয়োজন আছে – এই মানবিক স্বীকৃতিটাই এখন জরুরি। গণমাধ্যমে যদি নারীর পাশাপাশি পুরুষের আত্মত্যাগকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করা হয়, তাহলে সামাজিক স্বীকৃতি বাড়বে। একইসঙ্গে রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব আছে পুরুষদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা।

সবশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের পুরুষ মানুষের জীবন আসলে এক নীরব আত্মত্যাগের গল্প। এই গল্পের ভেতরে আছে পরিশ্রম, বিসর্জন, এবং অদৃশ্য কষ্টের দীর্ঘ অধ্যায়। কিন্তু সমাজ এখনো তাদের সেই আত্মত্যাগকে যথাযথভাবে স্বীকৃতি দেয়নি। সংসারের স্বার্থে তারা নিজেদের জীবনকাল ছোট করে ফেলছেন, অথচ আমরা তা দেখেও দেখছি না। এখন সময় এসেছে এই নীরব আত্মত্যাগকে দৃশ্যমান করার, পরিবারে ও সমাজে এর যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার। একটি সুস্থ সমাজ গড়ে ওঠে তখনই, যখন প্রতিটি অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, প্রতিটি আত্মত্যাগকে মর্যাদা দেওয়া হয়। তাই আজ আমাদের অঙ্গীকার হোক–পুরুষের এই নীরব আত্মত্যাগকে অদৃশ্য না রেখে, মানবিকভাবে স্বীকৃতি ও যত্ন দেওয়া। কারণ পরিবার শুধু তখনই পূর্ণতা পায়, যখন প্রতিটি সদস্য সমানভাবে ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা ও যত্নের আসন পায়।

অন্ধকার ভেদ করে আলোর পথ

মোঃ মুহাইমিন মুন
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম

বর্তমানে একটি ডিজিটাল যুগের সময় পার করছি আমরা। এই সময়েও আমাদের সমাজে সকলের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন ও সমাজে নানাবিধ সমস্যা দেখতে পাওয়া যায়। আমরা যদি সেসকল বিষয়কে পূর্বের সাথে মিলিয়ে দেখি তবে বুঝতে পারি যে ডিজিটাল যুগের কারণে যত ইতিবাচক পরিবর্তন তৈরি হয়েছে, সেরকম কিছু নেতিবাচক পরিবর্তনও তৈরি হয়েছে। কিছু বিষয় আছে যেগুলোকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। যেমন-

১. **মোবাইল ফোনে আসক্তি :** আগেকার দিনে আমাদের সকলের হাতে হাতে হয়তো মোবাইল ফোন নামক যন্ত্রটি ছিল না। কিন্তু বর্তমানে এই মোবাইল ফোন যতটা সুবিধা নিয়ে এসেছে, মানুষের মধ্যে প্রায় ততটা আসক্তিও সৃষ্টি করেছে। অনেকেই মোবাইল ফোনে ফেসবুক, ম্যাসেঞ্জার, ইন্সটাগ্রাম, টিকটক, মোবাইল গেমিং ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে সবসময়। হাস্যকর হলেও সত্য, ৫ মিনিট মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে যেয়ে কিংবা একটি ভিডিও কিংবা কিছুক্ষণের জন্য রিল দেখতে বসে শত শত রিল, পোস্ট স্ক্রল করে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট হচ্ছে। সবসময় অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে তা একসময় আসক্তিতে পরিণত হয়। এসকল আসক্তি অনেকের জন্যই ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায়।

২. **খেলাধুলায় আগ্রহ :** শিশু-কিশোররা মোবাইল ফোনে, ট্যাবলেটে, কম্পিউটার বা ল্যাপটপে গেমস খেলায় আসক্ত হওয়ার কারণে দিনে দিনে খেলাধুলায় আগ্রহ হারাচ্ছে। তাছাড়া পর্যাপ্ত মাঠ ও খেলাধুলার জায়গা না-থাকায় শিশু-কিশোররা বিকেলবেলা বা নিজেদের অবসর সময়ে মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট, কম্পিউটার বা ল্যাপটপেই সময় কাটায়।

৩. **বই পড়ার অনাগ্রহ :** কিশোর-কিশোরীদের মাঝে মাঝে বই পড়ার আগ্রহ লোপ পাচ্ছে। মোবাইল ফোন বা ডিজিটাল ডিভাইসে আসক্ত হওয়ার কারণে অনেকে বই থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কয়েক বছর আগের দিনগুলিতেও প্রায় অনেক বাসা-বাড়িতেই খবরের পত্রিকা রাখা হতো। কিন্তু এখন এগুলো কমে যাচ্ছে। বর্তমানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্সের অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে মানুষ মুক্তভাবে চিন্তা করতে পারছে না। লেখালেখির দক্ষতা ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

৪. **শারীরিক পরিশ্রম :** শিশু-কিশোরদের খেলাধুলায় আগ্রহ যেমন কমেছে তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সকলের শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণও অনেক কমে যাচ্ছে। যেমন-এখন ঘরে বসে থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অনলাইনে অর্ডার করে কেনাকাটা করতে পারছে, খাবার কিনতে পারছে, অনেকে ঘরে বসে অনলাইনে অফিসের বিভিন্ন কাজ করতে পারছে অর্থাৎ আগের মতো শারীরিক পরিশ্রম সচরাচর হচ্ছে না। এসকল সুবিধা ইতিবাচক দিক। তবে মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে আমাদের মধ্যে শারীরিক পরিশ্রম অনেক কমে গিয়েছে। যার কারণে নানা রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া আমাদের জীবনের এসব কাজকর্ম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিশুদের উপর প্রভাব ফেলছে।

৫. **নেতিবাচক মনোভাব :** আমরা আমাদের সমাজে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়কে অনেক সময় নেতিবাচক হিসেবে দেখি। আমাদের অনেকের মধ্যেই হয়তো এই নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনার বিষয়টি আছে। যেমন : ধরা যাক আমরা কেউ হয়তো অনেক ভালো একটি কাজের উদ্যোগ নিয়েছি। কিন্তু এই কাজটি শুরুর আগেই হয়তো আমাদের মনে শুধু নেতিবাচক চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। এটি বড় ধরনের একটি সমস্যা, যেটা এই প্রজন্মে অনেক বেশি দেখা যায়। এই নেতিবাচক চিন্তাধারার কারণে অনেক ভালো কাজের ভালো পরিকল্পনা থাকলেও কাজগুলো শুরুই করতে পারি না আমরা।

৬. **পরিবারকে সময় দেয়া :** আমরা যদি আজ থেকে ৩০ বছর পূর্বের কথা চিন্তা করি তবে দেখতে পাই, মানুষ পরিবারের সাথে যথাযথ সময় কাটাত ও পরিবারে একে-অপরকে সময় দিত। কিন্তু এখন কাজের ব্যস্ততায় বা যৌথ পরিবার কমে যাওয়ার কারণে আগের মতো অবস্থা নেই। বর্তমানে যৌথ পরিবার আছে তবে তা আগের তুলনায় অনেক কম। অর্থাৎ যৌথ পরিবার নেই বললেই চলে। এখন কোনো পরিবারে এমনও লক্ষ করা যায় যেখানে রাতের বেলা খাবার টেবিলে কবে সবাই একসাথে বসে খেয়েছে তা মনে করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। পরিবারের কাছে যথাযথ সময় না পেলে বা নিজের মনের কথা কাউকে বলার সুযোগ না-পেলে শিশু-কিশোরদের মধ্যে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

৭. **নিয়মানুবর্তিতা :** আমাদের সমাজে বিভিন্ন কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার অভাব লক্ষণীয়। একজন মানুষের নিয়মিত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন। কিন্তু এই ঘুম এখন সোনার হরিণ। সমাজে অনেক কিশোর-কিশোরীদের অনেকেই সকল নিয়ম জানা সত্ত্বেও সঠিকভাবে নিয়মকানুন পালন করে না। এসব থেকে অন্যরাও প্রভাবিত হয়। প্রাত্যহিক জীবনে কেনো রুটিন অনুযায়ী নিজেদের কাজ না করায় আমরা দিনে দিনে পিছিয়ে পড়ছি।

৮. **মানসিক স্বাস্থ্য :** মানসিক স্বাস্থ্য, এই শব্দ দুটি ছোট হলেও এর গুরুত্ব বলে বোঝানো খুবই কঠিন। একটি মানুষের সঠিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখাটা খুবই জরুরি। আমরা সবাই শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখলেও মানসিক স্বাস্থ্যের কথা ভুলে যাই। একটি মানুষের যদি মানসিক স্বাস্থ্য সঠিক না থাকে, সে বাস্তব জীবনের সকল কাজে ঠিকমতো মনোযোগ দিতে পারে না। তবে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। অনেক ছেলেমেয়েরাই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মানসিক চাপে থাকে ও পরবর্তীতে হতাশা এবং বিষণ্নতায় ভোগে।

৯. **হতাশা ও বিষণ্নতা :** বর্তমান সময়ে কিশোর-কিশোরীদের অন্যতম প্রধান একটি সমস্যা হলো হতাশা ও বিষণ্নতা। আমাদের সমাজে অনেক ছেলেমেয়েরা এই সমস্যায় ভুগছে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া, পড়ালেখার চাপ, পারিবারিক সমস্যা, অভাব-অনটন, দরিদ্রতা, প্রেমে ব্যর্থতা ইত্যাদি নানা কারণে ছেলেমেয়েদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ব্যস্ততা, অনেকক্ষণ ধরে কাজ করা, ঘুম কম হওয়া, মানসিক চাপের কারণেও বিষন্নতার সৃষ্টি হয়। একটি পর্যায়ে যেয়ে তারা হতাশায় ভোগে ও একাকিত্ববোধে থাকে এবং পরবর্তীতে বিষণ্নতায় পতিত হয়।

১০. **আত্মহত্যা :** বিষণ্নতার পরবর্তী একটি সমস্যা হলো আত্মহত্যা। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রেই আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না অনেকেই। তারা বিষন্নতায় ভোগে এবং শেষপর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান হিসেবে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় যেটি একদমই উচিত নয়।

১১. **মাদকাসক্তি :** কিশোরদের মধ্যে কেউ কেউ খারাপ বন্ধুদের সঙ্গের কারণে মাদক নামক ভয়াবহ নেশায় জর্জরিত হয় কিংবা অনেকে হতাশা ও মানসিক চাপে থেকে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। মাদক গ্রহণ শুরু করলে প্রথমে সে আসক্ত থাকে না কিন্তু পরবর্তীতে নিয়মিত মাদক গ্রহণ করলে ভয়াবহভাবে এটি আসক্তিতে পরিণত করে। কখনো কখনো এমন অবস্থা দাঁড়ায় মাদক ছাড়া তারা কিছুই করতে পারে না। অনেকে মাদকের মাধ্যমে দিনে দিনে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

সমাধান কী?

আমাদের সমাজে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এরকম আরও সমস্যা রয়েছে যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিশু-কিশোরদের উপর প্রভাব ফেলেছে। তবে এসকল বিষয়ের সমাধানও রয়েছে। কিশোর-কিশোরীদের এসকল সমস্যা প্রতিরোধের জন্য আমরা বিভিন্ন কাজ করতে পারি। শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মোবাইল ফোনের ব্যাপারে সচেতন করতে হবে। পরিবার থেকেই শিশুদের মধ্যে মোবাইল ফোনের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মোবাইল ফোনকে শিক্ষামূলক কাজে ব্যবহার শুরু করতে হবে। মোবাইল ফোনে বা কম্পিউটারে ছোটবেলা থেকেই সৃজনশীল কিছু করার চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। যেমন : গ্রাফিক্স ডিজাইনিং, ভিডিও এডিটিং, অ্যানিমেশন, কোডিং, প্রোগ্রামিং ইত্যাদি যথাসম্ভব শেখার চেষ্টা করতে হবে। অনেকেই ছোটবেলা থেকেই এসকল সৃজনশীল কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখে। এছাড়া নিজে থেকে কিছু তৈরি করার সক্ষমতাও তৈরি করা প্রয়োজন। তাছাড়া অনেকে কোনোকিছু না-জেনে অনলাইনে বিভিন্নভাবে প্রতারণার ফাঁদে পা দেয়। এসব ক্ষেত্রেও শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সচেতন করতে হবে। শিশুদের মাঝে বই পড়ার মানসিকতা গড়ে তুলতে পারলে তা ভবিষ্যতে অনেক ভালো ফল বয়ে আনবে।

ঢাকা শহরে প্রত্যেক এলাকায় একটি করে মাঠ থাকা প্রয়োজন। যদিও শহরে এই দালানকোঠার ভিড়ে মাঠ খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব কাজ। তবে আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে প্রত্যেক এলাকায় মাঠ তৈরি করতে পারি। কিছু কিছু জায়গায় মাঠ থাকা সত্ত্বেও সেখানে মাঠ অপরিষ্কার থাকার কারণে খেলাধুলা সেভাবে হয় না। আমরা সেসকল মাঠ সংস্কারের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে পারি। প্রতিটি মাঠ সংস্কার করে মাঠের পাশে একটি পার্ক নির্মাণ করা যেতে পারে। এছাড়া খেলাধুলায় আগ্রহ সৃষ্টির জন্য প্রতি এলাকায় প্রতি মাসে একটি করে ক্রিকেট, ফুটবল বা অন্যান্য খেলার টুর্নামেন্ট আয়োজন করা যেতে পারে। শিশুদের মধ্যে এমনভাবে চিন্তার

বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন যেন তারা নেতিবাচক চিন্তাধারা থেকে দূরে থাকতে পারে। ছোটবেলা থেকেই সকলের মাঝে ইতিবাচক মনোভাবের বিকাশ ঘটাতে হবে। শিশুদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায় কিছু কিশোর-কিশোরীরা প্রতিভাবান হলেও আত্মবিশ্বাসের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে যায়। যেমনঃ কোনো একটি শিশু হয়তো অনেক ভালো কবিতা আবৃত্তি করতে পারে কিন্তু তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের বড়ই অভাব। এই অবস্থায় অনেকেই জীবনের বিভিন্ন জায়গায় পিছিয়ে যায়। এক্ষেত্রে পরিবারকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। পাশাপাশি সামাজিকভাবে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। আমরা এগুলো বিষয়ে টেলিভিশন, খবরের পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সকলের মাঝে সচেতনতা তৈরি করতে পারি।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সকল কাজকর্মকে ছোটবেলা থেকেই একটি রুটিনের মধ্যে আনা প্রয়োজন। যদি একটি ছেলে বা একটি মেয়ে ছোটবেলা থেকে নিজের সকল কাজ যেমন- স্কুল-কলেজ, বাসায় নিজের পড়াশোনা, খাবার খাওয়া, শারীরিক ব্যায়াম, খেলাধুলা, ঘুম ইত্যাদির রুটিন করে নির্দিষ্ট সময়মতো করতে থাকে তবে সে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সবার থেকে অনেকাংশেই এগিয়ে থাকতে পারবে। তার সকল কাজ গোছানো থাকবে ও সময়ের সঠিক ব্যবহার হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সপ্তাহে অন্তত একদিন শিশু ও কিশোর-কিশোরদের নিয়ে কোথাও ঘুরতে যাওয়া উচিত। এছাড়া আমাদের সপ্তাহে অন্তত একদিন সকল ডিজিটাল ডিভাইস যেমন- মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, টেলিভিশন ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা দরকার। আমাদের সবসময়ই এরকম একটি দিন প্রয়োজন যেদিন আমরা থাকব সম্পূর্ণ মুক্তভাবে। সকল মানসিক চাপকে দূরে সরিয়ে দিয়ে একটি দিন আনন্দের জন্য বেছে নিলে মন্দ হয় না।

হতাশা ও বিষণ্নতা দূর করার অন্যতম উপায় নিজেকে নানা প্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত রাখা। কেউ যদি নিজেকে একা ভেবে নিজের মতো নিজের একটি জগতে বাস করে তবে তার হতাশা ও বিষন্নতা আরও বেড়ে যাবে। তাই সবারই উচিত হতাশা বা মন খারাপের সময়ে নিজেকে পড়াশোনা বা অবসর সময়ের অন্যান্য কাজে ব্যস্ত রাখা। হতাশা ও বিষন্নতা দূর করার জন্য নিজের শখের কাজটি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- কারো শখের কাজ যদি হয় বই পড়া, ছবি আঁকা, লেখালেখি করা, আবৃত্তি করা, ক্রিকেট বা ফুটবল খেলা ইত্যাদি, তাহলে সে সেই কাজগুলো করবে। হতাশা ও বিষন্নতা দূর করার জন্য অধিক নেতিবাচক চিন্তা বর্জন করতে হবে। পরিবার ও বন্ধুদের যথাযথ সময় দিতে হবে। একজন হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে যখন পরিবার বা বন্ধুরা যথাযথভাবে সময় দিতে পারে না তখন সে আরও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এমন এক সময় আসে যখন সে হয়তো মাদকদ্রব্য গ্রহণ শুরু করে দেয়। শেষ পর্যায়ে কোনো উপায় না-পেয়ে আত্মহত্যা করে। আমাদের দেশে আত্মহত্যা দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের এই সমস্যা প্রতিরোধ করতে কিশোর-কিশোরীদের সচেতন করতে হবে। কখনো কোনো ছেলে বা মেয়েকে যদি তার বন্ধু বা পরিচিতজনরা হতাশাগ্রস্ত দেখে তবে হতাশাগ্রস্ত শিশু বা কিশোর-কিশোরীর পরিবারকে বিষয়টি জানানো প্রয়োজন। আমার মতে একজন মানুষের পরিবার মানুষটিকে খারাপ থেকে ভালো পথে নিয়ে আসতে অপরিসীম ভূমিকা রাখে। শিশু-কিশোররা স্কুল-কলেজে কাদের সাথে মিশছে ও সঠিক বন্ধু নির্বাচন করছে কিনা এসব ক্ষেত্রে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের সজাগ থাকা জরুরী।

তাছাড়া মাদকাসক্তি দূর করার জন্য পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্কুল বা কলেজে মাদকাসক্তি নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন সেমিনার আয়োজন করা যেতে পারে। শিক্ষকরা সবসময়ই চেষ্টা করেন এসকল বিষয়ে সকল শিক্ষার্থীদের সচেতন করার। তার পাশাপাশি স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ক্লাব ও অন্যান্য সহপাঠ্যক্রম কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়। পড়ালেখার পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন হয়ে থাকে। এসকল কাজের মধ্যেমে সকলে মাদকাসক্তিসহ বিভিন্ন অনৈতিক কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখতে শিখে। সকলে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন গুণাবলি অর্জন করতে পারে যেমন-নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা, সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি।

বর্তমান যুগে আমাদের প্রায় সকলেরই জীবনযাত্রার মান অনেক সহজ ও উন্নত হয়েছে। তাছাড়া এই ডিজিটাল যুগে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা অনেক সুবিধা লাভ করেছি। কিন্তু আমাদের সকল কিছুরই নেতিবাচক দিক বর্জন করে ও ইতিবাচক দিক গ্রহণ করে ভালো কাজের মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সবাইকে সবার জায়গা থেকে সচেতন হতে হবে। শিশুদের সকল বিষয়ে সচেতন করতে হবে যেন তারা জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। একটি দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য তরুণ প্রজন্মের সঠিক পথে থাকা প্রয়োজন। আমাদের সকলের মধ্যে নিজেকে সেরা হিসেবে প্রমাণ করবার এবং বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে সেরা হিসেবে প্রমাণিত করার শক্তি, সাহস ও যোগ্যতা আছে। নিজেদের উপর এই বিশ্বাস রেখে আমাদের সবাইকে একসাথে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

পুস্তকে প্রাণরস

শামিয়া পারভিন অরিন
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব পিস্, কনফ্লিক্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইট্স

'বই হচ্ছে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু' - এই বহুল পরিচিত কথাটি তো আমাদের সবার জানা। কিন্তু, আমরা এটা মানি কজন? কিংবা মানলেও তা অনুশীলন করি কজন? বরঞ্চ, বাক্যটিকে আমরা 'নামমাত্র' উপদেশ দেওয়ার জন্যই ব্যবহার করি, নয়তো বা স্কুলের ইংরেজি রচনা পড়ার মতো আওড়াতে থাকি – Books are our best friends। কিন্তু বাস্তবে আমরা কখনো বই পড়ার চর্চা কি করি? হাতে গোনা কয়েকজনকে হয়তো পাওয়া যাবে যাদের এই অভ্যাসটি রয়েছে। আমাদের বেশিরভাগেরই বইয়ের সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠেনি।

মাইক্রোসফ্টের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস একসময়ে পৃথিবীর শীর্ষ ধনী ছিলেন যিনি, তিনি যেখানেই যান না কেন, যেখানেই থাকেন না কেন, তার সাথে সবসময় বই থাকে। তার অফিসটাও বইয়ে ভরপুর। শুধুমাত্র তিনিই নন, বিশ্ব জুড়ে এমন অনেক সফল ব্যক্তি আছেন, যারা তাঁদের সর্বোত্তম সঙ্গী হিসেবে বইকে বেছে নেন, এবং অনেকেই মনে করেন তাদের সফলতার পেছনে বইয়েরই ভূমিকা রয়েছে।

বই চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি করে, কোনো ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করার মতো করে মস্তিষ্কে সক্রিয় করে তোলে। বর্তমানের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কারণে মানুষের এই ক্ষমতা ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি সিনেমা ও একটি বইকে তুলনা করা যেতে পারে। একটা দৃশ্য সিনেমাতে দেখলে সেখানে মস্তিষ্কের কোনো কাজ থাকে না। পর্দায় প্রদর্শিত ঘটনা কোনোরকম প্রক্রিয়া ছাড়াই আমাদের চোখ ও কান শোষণ করে নেয়। কিন্তু একই ঘটনা আমরা যখন কোনো বইয়ে পড়ি, সেই দৃশ্যের প্রতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ জিনিস আমাদের মস্তিষ্ক নিজের মতো করে সাজিয়ে নেয়, এমনকি বইয়ে বলা কথোপকথনগুলোও যেন কানে বাজতে থাকে। এভাবেই বই পড়লে চিন্তা করার দক্ষতা তৈরি হয়, যা কোনো প্রযুক্তির দ্বারা তো একেবারেই অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'লাইব্রেরি' পড়লেই বোঝা যায় বইয়ের মাহাত্ম্য ঠিক কতখানি। তিনি সেখানে বলেছেন– *'এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে'*। বই ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে, শত বছরের আগের কাহিনিও অবিকৃতভাবে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার ক্ষমতা রাখে। যুগ যুগ ধরে ঘটে আসা কোনো অন্যায়, কিংবা মহান ব্যক্তিগণের মহৎ কর্ম–সবই বইয়ের পাতায় সযত্নে সংরক্ষিত তাকে। তবে কালের প্রক্রিক্রমায় কিংবা আধুনিকতার ছোয়ায় আমাদের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে এই অভ্যাসটি বিলুপ্ত হচ্ছে।

আমরা যে একেবারেই বই পড়ি না, সেরকমটা না। কিন্তু, আমরা আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট বইগুলো ছাড়া অন্য কোনো বই পড়তে আগ্রহী হই না, যেগুলো আমাদের মধ্যে রসবোধ জাগ্রত করে, জ্ঞানের পরিধি বাড়ায় ও সৃজনশীলতা তৈরি করে। যেখানে বই পড়ার অভ্যাস একেবারে শিশুকাল থেকে হওয়া প্রয়োজন, সেখানে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক আর নোটবইয়ের বাইরে অন্য কোনো বইয়ের ধারে-কাছেও যেতে চায় না। এমনকি অভিভাবকদেরও সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। বরং, কীভাবে সন্তান 'ভালো রেজাল্ট' করতে পারে, সেদিকেই বেশি নজর। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং 'ভালো রেজাল্ট' হয়তো 'ভালো শিক্ষার্থী' তৈরি করে, কিন্তু বই 'ভালো মানুষ' তৈরি করে। শিক্ষার্থীদেরকে প্রতিষ্ঠান থেকেও বই পড়তে সেভাবে উৎসাহিত করা হয় না। তাদেরও ওই একই দিকে নজর–ভালো রেজাল্ট। অনেক প্রতিষ্ঠানে তো লাইব্রেরিই নেই, আর থাকলেও অনেক প্রতিষ্ঠান মনে করে সেই জায়গা শিক্ষার্থীদের জন্য নয়, তা তালাবদ্ধই ভালো।

স্কুল-কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে এসে নতুন করে আর বই পড়ার অভ্যাসটা সাধারণত কারও মধ্যে তৈরি হয় না। এই যেমন, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের কাছ থেকে কত কত বইয়ের সাজেশন পায়, আর শিক্ষকেরাও বইয়ের হার্ডকপি ও সফ্টকপি–উভয়ই প্রদান করে থাকে। তবে দিনশেষে শিক্ষার্থীরা বেছে নেয় কয়েকটা স্লাইড, অথবা চলে যায় 'চ্যাটজিপিটি' নামক এক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারে। এমন করেই আমরা সবাই বই বিমুখ হয়ে পড়ছি, যার ফলে লোপ পাচ্ছে আমাদের ধৈর্যশক্তি, কল্পনাশক্তি, চিন্তা করার দক্ষতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, সৃজনশীলতা এবং একইসাথে আমরা হারিয়ে ফেলছি বাংলাসাহিত্যের প্রতি আগ্রহ।

হাজার বছরের পুরোনো চর্যাপদ থেকে শুরু করে বর্তমানের আধুনিক সময়ের লেখা পর্যন্ত, বাংলা সাহিত্যের সম্ভার কালে কালে উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিম কিংবা মুনীর চৌধুরী, জাহানারা ইমাম, আহমদ ছফা, রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, হুমায়ুন আহমেদ–জনপ্রিয় ও প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বইয়ের পাতায় ঠাঁই পেয়েছে। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি–সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্র কাগজের তৈরি বইয়ে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে রচিত, যা বাংলাকে জানার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আজকের এই প্রগতিশীল সময়ে এসে ই-বুক ও বইয়ের সফ্টকপি ব্যবহারে হারিয়ে যাচ্ছে কাগজ-নির্মিত বইয়ের আবেদন। যে ভাববোধ ও অনুভূতি বইয়ের সাদা পাতায় খচিত কালো অক্ষরগুলোর মাঝে আছে, তা কখনোই ডিজিটাল পর্দার স্লাইডগুলো পড়ে পাওয়া সম্ভব নয়।

বই স্বপ্ন দেখায়, বাস্তব ও কল্পনার মাঝে ভারসাম্য রাখতে শেখায়, ভালো মানুষ হতে শেখায়। ভিত মজবুত না-হলে ইমারত যেমন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, ঠিক তেমনি বই পড়ার অভ্যাসটাও ছোটবেলা থেকেই তৈরি করা প্রয়োজন। ভিক্টর হুগোর একটা উক্তি আছে–*'বই মানব সমাজকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য জ্ঞান দান করে, অতএব বই হচ্ছে সভ্যতার রক্ষাকবচ'*। একটি মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে ও উন্নত করতে বইয়ের ভূমিকা অনেক। পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে দেশকে উচ্চপর্যায়ে নিয়ে যেতে এবং বিশ্বে একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান দেওয়ার জন্য বর্তমান প্রজন্মকে হতে হবে সৃষ্টিশীল, সংবেদনশীল, পরিশ্রমী ও দক্ষ নাগরিক, যা বই পড়ার অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব। সুতরাং, বাংলার সাহিত্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে এবং জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করতে আমাদের সকলেরই উচিত বই পড়ার চর্চা করা।

মা

এস এম নাফিজ উল আলম
শিক্ষার্থী
এমবিএ (প্রফেশনালস)

মারিয়া ভার্সিটি যাবি না? ওঠ তাড়াতাড়ি, কয়টা বাজে? কখন রেডি হবি, কখন খাবি? তোর তো চুল বাঁধতেই ১ ঘন্টা লাগে। 'উফ আম্মু আর ৫ মিনিট প্লিজ' 'আধ ঘন্টা ধরেই তো ৫ মিনিট ৫ মিনিট বলছিস। তোর ৫ মিনিট আর শেষ হবে না। ওঠ, এবার বাধ্য হয়ে উঠতেই হলো। কোনো রকম রেডি হয়ে ভার্সিটি গেলাম। রোজকার মতো আমি আজও লেট, আজও ক্লাসে এ টিচার চলে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আয়তুল কুরসি পড়তে থাকলাম।

'May I come in' বলার সাথে সাথেই ম্যাডামের চাহনি দেখেই বুঝে গেলাম দিনটা কেমন যাবে। এরপর শুরু হলো ম্যাডামের লেকচার, কোন টপিক থেকে যে কোন টপিকে চলে গেল বুঝতেই পারলাম না। কোনোরকম হজম করে ক্লাসটা পার করলাম। এরপর প্রত্যেকটি ক্লাসই বিরক্ত লাগতে শুরু করল। টি ব্রেকে ব্যাগের চেইন খুলেই মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। প্রতিবারের মতো আজও তাড়াহুড়ার কারণে টিফিন বক্সটা টেবিলের উপর রেখে এসেছি। যাইহোক, ম্যাডামের এর সকালের লেকচারে পেট অলরেডি ভরাই ছিল। ক্লাস শেষ করে বন্ধুদের সাথে গল্প করতে করতে কখন যে দেড়টা থেকে আড়াইটা বেজে গেল বুঝতেই পারলাম না। বাসায় পা রাখতে না-রাখতেই শুরু হলো আম্মুর চিল্লাপাল্লা। 'আজকে না তোরে বারোটায় ক্লাস শেষ হয়েছে, দেখতো কয়টা বাজে এখন? তোকে কতবার বলছি যে রাস্তাঘাটে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা দিবি না, মানুষ খারাপ বলে তো।'

'বলুক I don't care'
'তা করবি কেন? বড় হচ্ছিস আর দিন দিন অভদ্র হচ্ছিস। যা এখন মোবাইল নিয়ে বসবি না। গোসল করে পড়াতে যা'
'তোমার বলা লাগবে না। আমার সময় হলে আমি ঠিকই যাব।'
তবুও কানের কাছে এফএম রেডিও বাজতেই থাকল; অস্বাভাবিক কিছু না। আম্মুর কাজই সারাদিন আমার উপর চিল্লানো।

একদিন টেবিলে বসে চা খাচ্ছিলাম। হঠাৎ কলিংবেল বেজে উঠল। মা দরজা খুলতেই উচ্চস্বরে কেউ বলে উঠল, 'আন্টি আসসালামু আলাইকুম।' গলা শুনেই বুঝতে পারলাম রাফিন এসেছে। ঘরে ঢুকেই বলতে লাগল, সারাদিন এত কষ্ট করে খেলে আসলাম আর তুই বসে বসে চা খাচ্ছিস। চায়ের কাপটা আমার হাত থেকে নিয়ে বলল, যা আমার জন্য চা বানা। বাধ্য হয়ে রান্না ঘরে ঢুকতেই হলো। চা খেতে খেতে রাফিন বলল, 'মালিহা কাল তো ভার্সিটি বন্ধ। চল কোথাও ঘুরে আসি। আমার আম্মু তো কোনোদিনও দিবে না রে। আরে দূরে কোথাও যাব না। আন্টিকে বলিস, আন্টি রাজি হলে আমাকে ফেসবুকে জানাস। ইসাত, অর্পা, ইফাত ওদেরকেও তো জানাতে হবে। আচ্ছা আমি তোকে জানাব।'
'আম্মু শুনো না।'
'হুম, বল।'
'আম্মু কাল আমাদের ভার্সিটি বন্ধ, তাই রাফিন, আমি, ইসাত, অর্পা, ইফাত সবাই মিলে ঘুরতে যাব। দূরে কোথাও যাব না। কাছেই যাব, যাই প্লিজ।'
'উচ্চস্বরে, না।'
'কিন্তু কেন আম্মু?'
আমি বলেছি না। এরপর আর একটা কথাও হবে না। 'আম্মু সবাই যাবে, যাই না প্লিজ, সবাই গেলেও তুই যাবি না।'

'মারিয়া বড় হয়েছিস, কখন কী হয়ে যায় বলা যায় না।'
'কী হবে আম্মু, কিছু হবে না।'
কোনোভাবেই আম্মুকে রাজি করা গেল না। আমি জানতাম আম্মু কখনোই রাজি হবে না। তাই ঠিক করলাম টিউশনের নাম করে আম্মুকে না বলেই যাব। যথারীতি আম্মুকে না বলেই গেলাম। ঠিক করলাম, নদীর পাড়ে যাব ঘুরতে। খুব আনন্দেই দিনটা কাটতে লাগল। বন্ধুরা পাশে থাকলে দিনটা খারাপ কাটার প্রশ্নই আসে না। নানান গল্পের মাঝে সময়ের খেয়াল রইল না। আমি বললাম, চল অনেক দেরি হয়ে গেছে। বেশি দেরি করলে আম্মু বুঝে ফেলবে পাশ থেকে ইসাত বলে উঠল, রোজ রোজ কি আসি নাকি? আর কিছুক্ষণ থাকি না। তোরা এখানেই থাক। আমি সামনে থেকে একটু ঘুরে আসি। আমি ওদেরকে রেখে একটু সামনে এসে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে একটু দূরেই এসে পড়লাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি দুই ঘন্টা হয়ে গেছে, আমি তাড়াতাড়ি করে আগের জায়গায় ফিরে গেলাম। গিয়ে দেখি ওরা আমাকে রেখেই চলে গেছে। ওরা ভেবেছে আমি হয়তো একাই বাসায় চলে এসেছি। আমি ওদেরকে খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু পেলাম না। খুব কষ্ট পেলাম। হঠাৎ একদিন বিছানায় শুয়ে মোবাইল চালাচ্ছিলাম। হঠাৎ করেই ফেসবুকে একটা অপরিচিত ব্যক্তি রিকোয়েস্ট দিলো, প্রোফাইল দেখেই ইমপ্রেস হয়ে গেলাম। তাই সাথে সাথেই রিকোয়েস্ট একসেপ্ট করে নিলাম। দুপুরবেলা ছেলেটার সাথে কথা হয়। কথা বলে ছেলেটাকে খুব ভালোই লাগল। ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে খুব ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠল। সারাক্ষণ ওর সাথেই টাইম স্পেন্ট করতে থাকি। আমি খুব সহজেই ছেলেটিকে বিশ্বাস করতে শুরু করলাম। আম্মু বলেছিলো ছেলেটিকে এত ভরসা না-করতে। আম্মুর তো সব ব্যাপারেই একটু বাড়াবাড়ি। সব কিছুই আম্মুর কাছে খারাপ। পৃথিবীতে সবাই খারাপ। আম্মু সবকিছুতেই রহস্য দেখতে পায়। তাই আম্মুর কথায় আর পাত্তা দিলাম না।

একদিন সোফায় বসে টিভি দেখছিলাম। বাবারও সেদিন অফিস বন্ধ ছিল। রুমের মধ্যে কাগজপত্র নিয়ে কিছু একটা করছিল। হঠাৎ করে আম্মুর মাথায় ব্যথা শুরু হলো। আম্মু অসুস্থ হয়ে পড়ল। বাবা আম্মুকে নিয়ে হাসপাতালে আসলো। ডাক্তার বিভিন্ন রকমের টেস্ট, এক্স-রে করে জানায় আম্মুর ব্রেনটিউমার হয়েছে। কথাটা শুনে আমি নিস্তব্ধ হয়ে গেলাম। কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। ডাক্তার আম্মুর ট্রিটমেন্ট করতে থাকে আর মেডিসিন দেয়। সব কিছুই বদলাতে শুরু করল।

আম্মু কেমন জানি শান্ত হয়ে গেলো। আগের মতো আর বকা দেয় না। ঘুম থেকে দেরি করে উঠলেও কিছু বলে না। পড়ালেখার জন্য আর রাগারাগি করে না। কিন্তু সেইদিন এইসব কিছু খুব মিস্ করছিলাম। আম্মুর রাগটা বারবার মনে পড়ছিল। ছোট ছোট বিষয়ে আম্মুর চিল্লানো, আম্মুর শাসন, বারণ মনে পড়তে থাকল এবং চোখ ভিজে গেলো কান্নায়। পাশের রুম থেকে আম্মু বেরিয়ে এসে বলল, 'কী হয়েছে মারিয়া।' কিছু বলার আগেই আম্মুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম। সেইদিন বুঝতে পেরেছি-আমি ভুল, আম্মু ঠিক। আম্মুর কথাগুলো রাগারাগি আর লেকচার ছিল না; বাস্তবতা ছিল। বুঝতে পারলাম, 'মা' কথাটা ছোট হলেও এর মর্ম হৃদয়ের গভীরে গ্রথিত।

নামের আগে ডাক্তার

রুবাইয়া বিনতে রকিব
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম

মফস্বলের এক চেনা শহর। ধুলাবালির রাস্তা, সিমেন্টে লেপা চায়ের দোকান, আড্ডা-হাসাহাসি। আর তার পাশেই কমলগঞ্জ স্কুলের খেলার মাঠ। এই এলাকার সবার পরিচিত একজন ভদ্রলোক আব্দুল মতিন। বয়স পঞ্চাশের মতো হবে। মাথায় টুপি, গায়ে হালকা ময়লা পাঞ্জাবি আর সাথে একটা পুরানো চামড়ার ব্যাগ। লোকটা নিজেকে সবার কাছে পরিচয় দেয়-'আমি ডাক্তার মতিন। অসুখ হলে আমাকে বলবে'। প্রতিদিন তিনি দোকানের এখানে আসেন। তার ব্যাগ খুলে ব্যান্ডেজ, কাঁচি এসব ঘাটাঘাটি করেন। আবার ব্যাগ গুছিয়ে চলে যান। মানুষজন তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। স্কুলের বাচ্চারাও তাকে নিয়ে মজা করে বলে- 'ঐ যে পাগল ডাক্তার'। দোকানদার নাসিম তাকে জিজ্ঞাসা করেন- 'কী ডাক্তারসাহেব, আজকে কার অপারেশন করবেন?' কিন্তু মতিন সাহেব এসবে কিছু মনে করেন না। তিনি হেসে মাথা নাড়িয়ে বলেন- 'মাথা ধরলে বলো; ওষুধ দেব'। তার চেহারায় দেখা যায় শান্ত অভিব্যক্তি।

এই এলাকায় একমাত্র ইব্রাহিম তাকে মনোযোগ দিয়ে দেখে। কমলগঞ্জ স্কুলের সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে ইব্রাহিম। মতিন সাহেবের সাথে ইব্রাহিমের খুব ভালো সম্পর্ক। মাঝে মাঝে ইব্রাহিম টিফিন টাইমে মতিন সাহেবের সাথে টিফিন ভাগাভাগি করে খায়। আবার ছুটির পরে চায়ের দোকানের বারান্দায় বসে মতিন সাহেবের সাথে গল্প করে। ইব্রাহিম মতিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে- 'আপনি কি ডাক্তার ছিলেন?'। মতিন সাহেব বলেন- 'ছিলাম না... এখনো আছি'। ইব্রাহিম মনে মনে ভাবে, তিনি যদি আসলেই ডাক্তার হন তাহলে সবাই কেনো এমন করে তার সাথে!!

লোকমুখে শোনা যায় মতিন সাহেব নাকি আগে সরকারি হাসপাতালে চাকরি করতেন। কেউ বলে- 'মেয়েকে বাঁচাতে না-পেরে মানুষটা পাগল হয়ে গেছে'। আবার কেউ বলে- 'ওসব বানানো গল্প। মাথা ঠিক নেই ওর'।

স্কুলে টিফিন টাইম চলছে। ইব্রাহিম ও তার বন্ধু রিফাতসহ বাকিরা ফুটবল খেলছে। একটা হেড শট নিতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে যায় রিফাত। উঠে দাঁড়ায় না। ইব্রাহিম ছুটে যায় তার বন্ধুর কাছে। দেখে সাড়া নেই। শ্বাস নিচ্ছে না। চারদিকে দৌড়াদৌড়ি, চিৎকার। কেউ বলে, 'পানি আনো!' কেউ ছুটে গেছে শিক্ষককে ডাকতে। কেউ ফোন করছে অ্যাম্বুলেন্সে। ইব্রাহিম কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। টেনশনে কপাল বেয়ে ঘাম পরতে শুরু করেছে ইব্রাহিমের। এক অভিভাবক বলেন, 'গরমে মাথা ঘুরে গেছে।' কিন্তু কেউ বুঝতে পারছে না ওর আসলে হার্টবিট বন্ধ হয়ে গেছে।

এমন সময় কোথা থেকে মতিন সাহেব দৌড়ে আসলেন। বলতে লাগলেন- 'সরে যান সবাই। ওর Cardiac Arrest হয়েছে। আমি CPR জানি।' লোকজন থমকে যায়। একজন বলে, 'এই পাগল লোকটা আবার চিকিৎসা করবে?' আরেক অভিভাবক চিৎকার করেন, 'কিছু হয়ে গেলে দায় কে নেবে?'। মতিন সাহেব বলেন- 'সময় নেই। দয়া করে সরে দাঁড়ান। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি'। ইব্রাহিমদের শিক্ষক রফিক বলেন - 'ওনাকে সুযোগ দিন। এই মুহূর্তে আমাদের আর কোনো রাস্তা নেই।' ইব্রাহিম বলে উঠে- 'মতিন আঙ্কেল আপনি কিছু একটা করেন প্লিজ'।

মতিন সাহেব আর সময় নষ্ট না-করে শুরু করে দেন। CPR দিতে দিতে মনে পড়ে তার ছোট মেয়ের মুখ। যখন মেয়েটা শ্বাস নিতে পারছিল না...যখন তাকে হাসপাতালে নেওয়ার সময় ট্র্যাফিকে আটকে পড়েছিলেন...। তার চোখে পানি আসে, কিন্তু হাত কাঁপে না। তিনি রিফাতের বুক চেপে ধরেন... এক, দুই, তিন... মুখে বাতাস দেন... আবার চাপ...৪০ সেকেন্ড, ১ মিনিট, ২

মিনিট...হঠাৎ একটা শব্দ, রিফাত কাশি দিয়ে ওঠে। ইব্রাহিমের অস্থিরতা থেমে এক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কিন্তু সবাই স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে মতিন সাহেবের দিকে।

এর মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স চলে আসে। সবাই দৌড়ে রিফাতকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের গেটে ডাক্তার বলেন - 'ভাগ্যিস CPR দেওয়া হয়েছিল। ২ মিনিট দেরি হলে বাঁচানো যেত না।'

রিফাতকে রেখে এসে ইব্রাহিম দেখে মতিন সাহেব চায়ের দোকানটার পাশে বসে আছে। ইব্রাহিম চুপচাপ গিয়ে তার পাশে বসে। পাশেই পড়েছিল মতিন সাহেবের চামড়ার ব্যাগটা। ইব্রাহিমের মনে কৌতূহল জাগল। সে ব্যাগটায় উঁকি দিয়ে দেখে তাতে ভাঁজ করা পুরানো একটা নথি। কাগজটা হাতে নিয়ে খুলে দেখে ইব্রাহিম। লেখা MBBS, Rajshahi Medical College. সার্টিফিকেটটা দেখে অবাক হয়ে যায় ইব্রাহিম। অনেক্ষণ কাগজটার দিকে তাকিয়ে থাকে ইব্রাহিম কিন্তু কিছু বলতে পারে না।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ব্যাগটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মতিন সাহেব। মফস্বলের রাস্তায় হাঁটতে লাগলেন। চেহারায় সেই শান্ত অভিব্যাক্তি। ইব্রাহিম পেছন থেকে তার হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য দেখছে আর মনে মনে ভাবছে- 'সে কি আসলেই ভুলে গিয়েছিল নিজের পরিচয়? নাকি আমরাই তাকে চিনতে ভুল করেছিলাম?'

এক টুকরো পাউরুটি

ইমরানুল হক চৌধুরী
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ

ভার্সিটিতে ক্লাস শেষে চায়ের স্টলে বসে আছি, পাউরুটিটা চায়ে চুবিয়েছি কেবল, ঠিক তখনই পাঁচ-ছয় বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে পাশে এসে দাঁড়াল। পরনে ছেলেদের মতো হাতাকাটা গেঞ্জি আর ঢিলেঢালা হাফপ্যান্ট। এই শীতে ওর পোশাকটা কতটুকু শীত আটকাচ্ছে, কে জানে!

আমার দিকে তাকিয়ে সোজা হাত বাড়াল। আমি সাধারণত পথশিশুদের টাকা-পয়সা দেই না, অভ্যেস খারাপ হয়ে যাবে তাদের। তাই বললাম, 'মাফ কর, টাকা-পয়সা দিতে পারব না। কিছু খেতে চাইলে বল, কিনে দিচ্ছি।'

মেয়েটি কিছু না-বলে হাতের পাউরুটির দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকল। দোকানদার মামা রেগে গিয়ে কিছু বলতে চাইলেন, বাঁধ সাধলাম আমি। 'থাক মামা,' বলে নিজেই একটা রুটির প্যাকেট ছিঁড়ে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। আচমকা সে আমার হাত থেকে প্যাকেটটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেল মানুষের ভিড়ে।

দোকানদার মামা একটু কাঁচুমাচু স্বরে বললেন, 'মাইয়াডা কথা কইবার পারে না, কিন্তু সব বোঝে। কেউ কিছু দিলে এমনেই কাইড়া লইয়া যায়।' মেয়েটা বোবা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল আমার। ঠিক করলাম, পরের বার দেখা হলে ওকে আবার পাউরুটি কিনে দেব।

জানি না কবে থেকে, হঠাৎ খেয়াল করলাম নিয়মিত বাচ্চাটাকে পাউরুটি কিনে দিচ্ছি, আর সে আগের মতোই ছুটে পালাচ্ছে। ওর প্রতি জন্মে গেছে একধরনের মায়া।

জানুয়ারিতে টিউশনির বেতন পেয়ে ঠিক করলাম ওর জন্য একটা সোয়েটার কিনব। কিন্তু জীবনে কারও জন্যে কিছু কেনা হয়নি আমার। অনেক খুঁজে ফুল আঁকা একটা সোয়েটার কিনলাম। কিন্তু বাচ্চাটির আর দেখা নেই, দোকানে আসে না কেন জানি। দোকানদার মামাও কিছু বলতে পারলেন না। সোয়েটারটা আমার ব্যাগেই পড়ে রইল।

প্রায় দিন পনেরো পর আবার ওর দেখা পেলাম। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আমি। ব্যাগ থেকে সোয়েটারটা বের করে ওর হাতে দিতেই, সে আগের মতোই দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সাইজ মিলেছে কি না, বা টিলাঢালা হয়েছে কি না, বোঝার সুযোগ পেলাম না।

পরের কয়েকদিন ভীষণ ব্যস্ততার মাঝে গেল। ভার্সিটিতে আমাদের ক্লাবের ইভেন্ট নামবে কয়েকদিন পর, গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসবেন। কর্তৃপক্ষের অনুমতির জন্য এক অফিস থেকে আরেক অফিসে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। এদিকে ঝামেলা শুরু করেছে ভার্সিটির কিছু পলিটিক্যাল গ্রুপ। তাদের বখরা না-দিয়ে কিছুতেই ইভেন্ট নামানো যাবে না। কথা কাটাকাটি থেকে বিষয়টা প্রায় হাতাহাতি পর্যায়ে চলে যাচ্ছিল। কোনোভাবে সামলানো গেছে।

মাথা ঠান্ডা করতে সেই চায়ের দোকানে গেলাম। সেদিন আবার মেয়েটির সাথে দেখা হলো, কিন্তু তার গায়ে সেই পুরোনো ছেঁড়া গেঞ্জি, সোয়েটারটা নেই। মনে হলো, হয়তো বিক্রি করে দিয়েছে। রাগের মাথায় বললাম, 'কিরে, সোয়েটার কী করেছিস? আজ তোকে কোনো পাউরুটি দেব না। ভাগ এখান থেকে।'

ঝিল দিয়ে উঠে হাঁটা ধরতেই সে পেছন থেকে আমার প্যান্ট টেনে ধরল। টাল সামলাতে না-পেরে পড়ে যাচ্ছিলাম প্রায়, ওর গালে কষে একটা চড় বসালাম। সাদা গালে আমার পাঁচ আঙুলের দাগ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। ওর চোখে পানি টলমল করতে দেখে সংবিৎ ফিরল আমার। এ কী করলাম! ওকে সান্ত্বনা দিতে হাত বাড়াতেই সে ছুটে পালিয়ে গেল। প্রচণ্ড অনুতাপে আমার বুকটা ভেঙে আসতে চাইছে।

এরপর থেকে সে আমাকে দেখলেই পালিয়ে যায়। খুব খারাপ লাগছে। কীভাবে ক্ষমা চাইব, ভেবে পাচ্ছি না।
হঠাৎ একদিনের ঘটনা। দোকানে ঢোকার আগেই দেখলাম সে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলো। তার চোখে-মুখে রাজ্যের ভয় আর আকুতি। আচমকা আমার হাত ধরে টানাটানি শুরু করল, যেন কোথাও নিয়ে যেতে চায়। ওর জন্য বরাদ্দ পাউরুটিটা হাতে নিয়ে পিছু পিছু চললাম।

একটা বস্তির ভেতরে প্রবেশ করেছি আমরা। সে অনেকগুলো গলি-ঘুপচি পেরিয়ে একটা টিনের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। টেনে ভেতরে নিয়ে গেল আমাকে। ঘরের ভেতর একটি মাত্র চৌকি, আর তাতে কঙ্কালের মতো শুকনো একটি মেয়ে শুয়ে আছে। বয়স সাত-আট হবে। আর তার পরনে আমার দেওয়া সেই ফুলওয়ালা সোয়েটারটা।

আমার সব রাগ, সব অভিমান, উবে গেল এক নিমিষে। বুঝলাম, সোয়েটারটা সে তার অসুস্থ বোনের জন্য রেখেছিল, আর আমি না বুঝেই ওকে মেরেছি। অনুতাপে মাথা নিচু হয়ে গেল আমার। পিচ্চি মেয়েটা পাউরুটি ছিঁড়ে ওর বোনের মুখে দেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু দুর্বল শরীর তা নিতে পারল না। বোনটি হড়হড় করে বমি করে দিল।

তখনই টনক নড়ল আমার। ভালো করে খেয়াল করে দেখলাম, অসুস্থ মেয়েটির চোখ, হাত-পা সব হলুদ। জন্ডিসের স্পষ্ট লক্ষণ। ওকে এক্ষুনি হাসপাতালে নেওয়া দরকার। অসহায়ভাবে কঙ্কালসার বোন আর পাশে দাঁড়ানো বোবা মেয়েটির মুখের দিকে তাকালাম একবার।

এই মুহূর্তে নষ্ট করার মতো সময় নেই। অসুস্থ মেয়েটিকে সাবধানে কোলে তুলে নিলাম। দুর্বল শরীরটায় ওজন নেই বললেই চলে। পিচ্চিটা আমার প্যান্ট খামচে ধরে বস্তির ভেতর থেকে প্রায় দৌড়ে বের হলো। একটা রিকশা ডেকে সোজা সরকারি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ছুটলাম।

ভর্তি করানোর পর ডাক্তার জানালেন, অবস্থা বেশ জটিল, জন্ডিস হয়েছে, না খেয়ে খেয়ে মেয়েটির শরীর মারাত্মক দুর্বল। স্যালাইনের সাথে দামি কিছু ইনজেকশন লাগবে। পকেটে যা টাকা আছে, তা দিয়ে কিছুই হবে না। হাসপাতালের করিডোরেই বসে পড়লাম আমি। ছোট বোনটা আমার শার্টের কোণ ধরে পাশে বসে আছে, ওর চোখে রাজ্যের ভয়।
ফোন বের করে আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু সাজিদকে কল দিলাম। বিস্তারিত বললাম সবকিছু। ও শুনে কোনো মন্তব্য করল না, বা কিছু জানতেও চাইল না। শুধু বলল, 'আসছি আমি।'

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সাজিদ আর ভার্সিটির আরও কয়েকজন বন্ধু মিলে হাজির ওখানে। নিজেদের হাতখরচ থেকে যা পেরেছে, জোগাড় করে এনেছে। সেই টাকা দিয়ে প্রাথমিক ওষুধপত্র কেনা হলো। এরপর আমি চায়ের দোকানের মামাকে ফোন করে সবটা জানালাম। তিনি সব শুনে বললেন, 'মামা, আপনে চিন্তা কইরেন না। আমি দেখতাছি।'

রাত প্রায় গভীর। হাসপাতালের বাইরে অপেক্ষা করছি আমি আর পিচ্চিটা। এমন সময় দোকানদার মামা বস্তির আরও কিছু লোকজনকে সাথে নিয়ে উপস্থিত। তিনি আমার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, 'এই নেন মামা। আমরা সবাই মিল্যা জোগাড় করছি। আপনারা স্টুডেন্ট মানুষ সবই বুঝি। আর কিছু লাগলে কইলেন।'

অবাক হয়ে মানুষগুলোর দিকে তাকালাম আমি। সামান্য পরিচয়ের সূত্র ধরে এতগুলো মানুষ সাহায্যের জন্য ছুটে এসেছে! কৃতজ্ঞতায় গলা ধরে এলো। কিছুদিন হাসপাতালের বেঞ্চেই দিনগুলো কেটে গেল আমার। যখন ক্লান্ত হয়ে বেঞ্চে ঘুমিয়ে যেতাম, পিচ্চিটা চুপচাপ আমার পাশে বসে থাকত। তার ছোট্ট আঙুল দিয়ে বিলি কেটে দিত আমার চুলে। তার এই নীরব ভাষাই যেন আমার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছে। এত কিছুর মাঝেও ওর জন্য পাউরুটি নিতে একদিনও ভুলিনি।

বাঁচতে দাও!

সাদিয়া তাসনিম
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স

মানুষ ভাবে, তারা গাছকে রক্ষা করছে। অথচ সত্যিটা উল্টো। আমরাই গাছেরা যুগের পর যুগ ধরে মানুষকে রক্ষা করে আসছি।

আমি এক পুরোনো বটগাছ। গ্রামের এই মাঠের ধারে আমি দাঁড়িয়ে আছি প্রায় শত বছর ধরে। কত প্রজন্ম আমার ছায়ায় খেলেছে, দৌড়েছে, হেসেছে! কারও প্রথম ভালোবাসার সাক্ষী হয়েছি আমি, আবার কারও একাকী কান্নারও সঙ্গী থেকেছি নীরবে। আমার বুকের ভাঁজে লুকিয়ে আছে গ্রামের অগণিত স্মৃতি।

আমার ডালে একসময় কত পাখি বাসা বাঁধত। সকালে তারা গান গাইত, পুরো গ্রাম যেন নতুন দিনের খবর পেত তাদের কিচিরমিচিরে। দুপুরে মাঠের কৃষকেরা কাজের ফাঁকে আমার ছায়ায় বসত, একটু বিশ্রাম নিত। শীতে শিশুরা আমার গুঁড়ির পাশে পিঠা খেত, গল্প করত, হাসিতে চারপাশ ভরে যেত। তখন মনে হতো, মানুষ আর গাছ যেন অদৃশ্য এক বন্ধনে বাঁধা একজন ছাড়া অন্যজনের বেঁচে থাকা অসম্ভব।

কিন্তু সময় বদলেছে। মাঠের জায়গায় এখন উঠেছে একের-পর-এক ঘর-বাড়ি। ধানের শিষে দুলতে থাকা বাতাসের জায়গা নিয়েছে ইট আর বালুর স্তূপ। আমার চারপাশের গাছ কেটে ফেলা হলো। শুধু আমি রয়ে গেলাম, হয়তো বয়স আর বিশালত্বের কারণে। কিন্তু আমি ভীষণ একা হয়ে গেলাম।

পাখিরা আর তেমন আসে না, কারণ আশেপাশে ডালপালা নেই। মানুষ আসে ঠিকই, কিন্তু তারা আর আকাশের দিকে তাকায় না। বসে মোবাইল ঘাঁটে। বাচ্চারা প্লাস্টিকের খেলনায় মেতে থাকে আমার ডালে দোল খাওয়ার আনন্দ তারা বোঝেই না।

আমার সবচেয়ে কষ্ট হয় যখন দেখি, আমার গায়ে পেরেক ঠুকে পোস্টার ঝোলানো হয়, নাম কেটে লেখা হয়। তখন মনে হয় চিৎকার করি 'থামো, আমি ব্যথা পাই!' কিন্তু গাছের তো কোনো ভাষা নেই। তাই নীরবে সহ্য করি। মানুষ ভাবে গাছের কোনো অনুভূতি নেই, অথচ প্রতিটি আঘাত আমাকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দেয়।

তবুও আমি প্রতিদিন মানুষের জন্য অক্সিজেন বিলাই, মাটি আঁকড়ে ধরি, বৃষ্টি ধরে রাখি। ঝড়ে যখন গ্রাম কেঁপে ওঠে, বুক পেতে দাঁড়িয়ে থাকি। কতবার আমার ডাল ভেঙে পড়েছে মানুষের ঘর বাঁচাতে, তবুও কখনো অভিযোগ করিনি। আমি জানি, আমার কাজ শুধু দেওয়া, চাওয়া নয়।

কিন্তু আমি জানি না আর কতদিন এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব। হয়তো একদিন কুঠার এসে আমাকেও কেটে ফেলবে। তখন হয়তো মানুষ বুঝবে, তারা কত বড় ভুল করেছে।

আমার শেষ কথা শুধু এটাই 'যেদিন তোমরা সত্যি বুঝবে, গাছ কেটে ফেলা মানে নিজের শ্বাস কেটে ফেলা, সেদিন হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। তার আগেই যদি ভালোবাসতে শেখো, তবে আমরাও তোমাদের প্রজন্মের মতো টিকে থাকতে পারব।'

আমি এখনো তোমাদের জন্য আছি। আমাকে নিঃশেষ করে দিয়ো না। আমাকে বাঁচতে দাও আমি তোমাদের বাঁচতে সাহায্য করব।

দশ টাকার স্মৃতি

মোঃ শাহরিয়ার রাব্বি
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

ছোট্ট একটা শহরের গণ্ডি পেরিয়ে ঢাকায় এসেছিলাম পড়াশোনার জন্য। বাবা-মায়ের অনেক আদরের সন্তান। আগে কখনো জেলা শহরের বাইরে সেভাবে থাকা হয়নি। দীর্ঘ লড়াইয়ের পরে বিইউপি নামক এক কাঙ্ক্ষিত জায়গায় সুযোগ মেলে। এইবার তো উপায় নেই। বাইরে যেতেই হবে। তাই সেই সুবাদে ঢাকায় আসা এবং এর সাথে জীবনের নতুন একটি অধ্যায়ের শুরু হলো। কিন্তু সূচনাতেই যে এমন চমৎকার একটি ঘটনার সাক্ষী হব, তা জানা ছিল না।

ক্লাস শুরুর প্রথম দিন। সকালবেলা সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে, মনের মধ্যে উত্তেজনা আর আতঙ্ক নিয়ে ক্লাসে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। চারপাশে সব কিছু যেন অচেনা আর অজানা। অপরিচিত সব মানুষজন। ইসিবি চত্বরে এসে দাঁড়ালাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে করে ক্যাম্পাসে যাব বলে। কিন্তু দেরি করে ফেলেছি। বাসগুলো সব আগেই চলে গেছে। এখন কীভাবে যাব তা ভেবে কূলকিনারা করতে পারছিলাম না। ঠিক তখনই চোখে পড়ল, গলায় বিইউপি আইডি কার্ড টাঙানো এক ভাইয়া দাঁড়িয়ে আছেন। আমিও তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনিও বাস মিস করেছেন।

ভাইয়াটি আমাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি এইবার ভর্তি হয়েছ?'

আমি একটু ইতস্তত বোধ করে উত্তর দিলাম, 'জ্বি ভাইয়া।'

উত্তর শুনে তিনি বললেন, 'আসো, অন্য বাস ধরতে হবে।'

তারপর একটি লোকাল বাসে উঠতে বলে তিনি নিজেও উঠলেন। সেই বাসে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও বেশ কয়েকজন ভাইয়া, আপু উঠলেন। বাসটি চলতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পরে যখন ভাড়া দেওয়ার সময় আসলো তখন আমি একটু সংকোচ নিয়ে জানতে চাইলাম, 'ভাইয়া, ভাড়া কত টাকা?'

তিনি তখন কোনোকিছু না-বলেই হঠাৎ নিজের পকেট থেকে একটি দশ টাকার নোট বের করে আমার ভাড়া দিয়ে দিলেন। আমি এক মুহূর্তের জন্য অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। যদিও টাকার অঙ্কটি ছিল খুবই সামান্য, কিন্তু বাড়ি থেকে এত দূরে, এই অচেনা শহরের মাঝে একজন অপরিচিত মানুষের কাছ থেকে এমন কিছু পাওয়া ছিল সত্যিই অপ্রত্যাশিত, যা আমার কাছে এক অমূল্য উপহার হয়ে উঠেছিল। চোখে তখন উনার প্রতি একধরনের কৃতজ্ঞতার অনুভূতি ভেসে উঠছিল। পথে হালকা কথোপকথনে সময় কেটে গেল। এই অচেনা শহরটা যেন কিছুটা আপন হতে লাগল। তারপর আমরা একসাথে ক্যাম্পাসে এসে পৌঁছালাম।

সময় পেরিয়ে এই নতুন জীবনে কেটে গেল দুই বছর। অসংখ্য মানুষের সাথে পরিচয় হলো, বন্ধুত্ব হলো। এই শহরের সাথে খাপ খাওয়ানো শিখে গেলাম। কিন্তু সেই ভাইয়ের সাথে আর কখনো দেখা হয়নি। তবে যখনই ইসিবি চত্বরের দিকে যাই, প্রতিবারই সেই ঘটনাটি মনে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম দিনের সেই ছোট্ট মুহূর্তের দশ টাকার স্মৃতি আজও আমার হৃদয়ে অমলিন রয়ে গেছে। জীবনে নানা ঋতু আসে-যায়, সময়ের স্রোতে অনেক কিছু বদলায়, কিন্তু কিছু স্মৃতি চিরকাল আমাদের সঙ্গে থেকে যায়।

অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা

ইফাতারা ইরা
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম

বলা হয়ে থাকে, অর্থই অনর্থের মূল। অর্থ নিয়ে আমাদের আগ্রহের কমতি নেই। সেই আগ্রহ থেকেই গত বছর চার বান্ধবী মিলে ঘুরতে গিয়েছিলাম দেশের অর্থ বানানোর কারখানা অর্থাৎ টাঁকশাল। যার প্রাতিষ্ঠানিক নাম-দ্য সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড। দেশের একমাত্র টাকা ছাপানোর এই কারখানার অবস্থান গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরের শিমুলতলীতে। ১৯৮৯ সাল থেকে অদ্যাবধি সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে আমাদের টাঁকশাল।

ভোরের আলো ফুটতেই শুরু হলো আমাদের উত্তেজনা। আমি আর আমার তিনজন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী-লিজা, জিনাত এবং তন্বীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম এক ভিন্নধর্মী ভ্রমণে। গন্তব্য : টাঁকশাল। আমাদের চারজনের কেউই আগে দেখিনি কীভাবে টাকা তৈরি হয়। আমার ধারণা দেশের অধিকাংশ মানুষই এই দেখার বাইরে। বাসে উঠে আমরা নানা হাস্যরসাত্মক কথোপকথন করতে করতেই পৌঁছে যাই গাজীপুর। তারপর রিকশা নিয়ে চলে গেলাম টাঁকশাল। এই প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। চাইলেই যে কেউ যখন তখন ঢুকতে পারেন না। এই ছাপাখানায় প্রবেশ করতে হলে চারটি ফটকে নিরাপত্তাকর্মী ও পুলিশকে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করতে হয়।

টাঁকশালে ঢুকতেই একটা নিরাপত্তার আবহ। সুশৃঙ্খল পরিবেশ, কঠোর নিয়মকানুন। প্রায় ৬৬ একর জায়গা নিয়ে গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠান সবুজে ঢাকা। এক ফটক থেকে অন্য ফটকে যাবার সময় মনে হতে পারে হয়তো আপনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে। সকল নিয়ম মেনে আমরা ঢুকে পড়লাম ছাপাখানার মূল ফটকে। তারপর একজন গাইড আমাদের নিয়ে গেলেন টাকা বানানোর এক অদ্ভুত দুনিয়ায়। বলে রাখা ভালো, এই প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করেন এবং যারা ঘুরতে আসেন তাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনসহ সব ধরনের জিনিসপত্র জমা দিয়ে তারপর ভেতরে যেতে হয়। কড়া নিরাপত্তার সাথে সম্পন্ন হয় প্রতিটি ধাপ। প্রথমেই আমরা দেখলাম কাঁচামাল-বিশেষ ধরনের কাগজ, যা সাধারণ কাগজ থেকে একেবারেই আলাদা। সেই কাগজেই ছাপানো হয় আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় টাকা। সেখানে গিয়ে চোখের জল নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থের জানান দিচ্ছিল। সব কাঁচামাল সংগ্রহ করা হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে। টাকার ডিজাইনে ন্যূনতম পরিবর্তন যথেষ্ট ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে।

টাকা বানানোর প্রতিটি ধাপের জন্যই আলাদা আলাদা হল রয়েছে। নির্ধারিত কর্মচারী ও কর্মকর্তা ছাড়া এক হল থেকে অন্য হলে যেতে হলে নিতে হয় এন্ট্রি পাস। ডিজাইন, প্রিন্টিং, সিকিউরিটি থ্রেড, জলছাপ, নম্বরিং এবং সবশেষে গণনা। চোখে-মুখে বিস্ময় নিয়ে আমরা দেখছিলাম সকল কার্যাদি। আধুনিক যন্ত্রপাতি আর দক্ষ কর্মীদের নিখুঁত কাজ; সব মিলিয়ে টাকার জন্ম যেন এক শিল্পকর্ম। সেখানে যারা কাজ করছিলেন তারাও আমাদের দেখে একটু অবাক হচ্ছিলেন। তবে তাদের সাথেও আমরা বেশ গল্প করেছি। টাকা বানানোর প্রক্রিয়াগুলি তারা সবিস্তারে আমাদের বোঝাচ্ছিলেন; আমরা দারুণ উপভোগ করছিলাম। সবগুলো ধাপ দেখে আমরা গেলাম টাকা গণনার হলরুমে। সেখানে গিয়ে আমাদের চোখ ছানাবড়া। সচরাচর আমরা অফিসের টেবিলে ফাইল, কলমদানি, টেবিল ক্যালেন্ডার এসব দেখে অভ্যস্ত। কিন্তু এখানে এসে দেখি সব টেবিলে টাকা আর টাকা। গরম গরম টাকার নোট গণনায় যাদের কাজ। মজার ছলে তাদের একজন, আমার হাতে ১০ লক্ষ টাকার একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিলেন। আমিও মজা করে বললাম, 'থ্যাংক ইউ ফর গিফটিং মি'। সকলেই অট্টহাসি দিয়ে উঠলেন।

এখানে যে শুধুই টাকা ছাপানো হয় ব্যাপারটা এমন নয়, সরকারের বিভিন্ন নিরাপত্তাসামগ্রী যেমন : অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সঞ্চয়পত্র, নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, রাজস্ব স্ট্যাম্প, আদালতে ব্যবহৃত বিভিন্ন নিরাপত্তামূলক সামগ্রী, স্মারক ডাকটিকিট, খাম, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ট্যাক্স লেবেল, ব্যাংকের চেক বই, প্রাইজবন্ড, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর জিএসপি ফরম, দেশের সব শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার নম্বরপত্র ও সনদ ইত্যাদি ছাপানোর জায়গা এই প্রতিষ্ঠান টাকা বানানোর হলরুম দেখার পর যখন আমাদের স্ট্যাম্প বানানোর হলরুমে নিয়ে যাওয়া হলো আমরা কেউই দেখার জন্য খুব বেশি আগ্রহ দেখালাম না। কেন দেখালাম না সেটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতেই পারছেন। কারখানার এক অংশে রয়েছে অতিথিদের জন্য থাকার ব্যবস্থা। রয়েছে পার্ক সাথে ছোট্ট পুকুর। যেখানে বিকেলে বসে চা খাওয়া এবং মাছ ধরার সুব্যবস্থাও আমাদের চোখে পড়ল।

এভাবেই শেষ হলো আমাদের টাঁকশাল ভ্রমণ। ভ্রমণ শেষে আমাদের মনে হলো, টাকা শুধু কেনা-বেচার মাধ্যম নয়, বরং এটি একটি দেশের নিরাপত্তা, শিল্প, প্রযুক্তি ও বিশ্বাসের প্রতীক। বিশ্বের অনেক দেশের টাকা মুদ্রণের কারখানা নেই কিন্তু আমাদের দেশে আছে। এই বিষয়টি নাগরিক হিসেবে আমাদের জন্য গৌরবের। টাঁকশাল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমাদের জ্ঞানের ঝুলিতে এক অনন্য সংযোজন হয়ে থাকবে।

অদৃশ্য শৃঙ্খল

অর্ঘ্য প্রতীক চৌধুরী
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব এনভায়রনমেন্টাল সাইন্স

১১ই আগস্ট, ২১২৫ সাল।

ভোর ছয়টা। ভোরের আলো ফোটার আগেই গলায় একটা আঁচড় লাগল। শুষ্ক, তেঁতো, ধাতব স্বাদের। ঘুমভাঙা নয়, এ যেন শ্বাসভাঙা। মুখ ঢেকে উঠতে গিয়েও হাত থেমে গেল। জানালার ন্যানোগ্লাসে লাল অক্ষরে কাঁপছে বার্তা, যেন রক্তজবা ফুটে আছে বরফে : ' বাতাসের মান ঝুঁকিপূর্ণ, একিউআই ইন্ডেক্স ৫৭৭, ঘরে থাকুন।'

আমি ড. আবির চৌধুরী, জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যানোইকোটক্সিকোলজির উপর পিএইচডি সম্পন্ন করে সদ্য যোগ দিয়েছি ঢাকার একটি পরিবেশ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে। আমার কাজ ঢাকার পরিবেশ দূষণ মনিটরিং করা। প্রতিদিনের মতো আজও রওনা হচ্ছি অফিসের উদ্দেশ্যে...

বাইরে তাকাতেই চোখ জ্বলে উঠল। ধোঁয়াশার ঘনঘটা শহরটাকে গিলে ফেলেছে। দানবাকৃতির অট্টালিকাগুলো যেন মৃত্যুর মুখে হাঁ করে থাকা দৈত্য। দূরে সোলার টাওয়ারের অস্পষ্ট আভা ভেসে বেড়াচ্ছে ধূসর সমুদ্রে, বিষাক্ত নভোনীলের আলোয় ছায়া হয়ে পড়ে আছে আমার হাত। হভারবাইক চালু করতেই ভাঙা হারমোনিয়ামের সুরে ইঞ্জিন কেঁদে উঠল। গাড়িটা কাঁপছে বিষাক্ত বাতাসের চাপে, যেন ডুবে যাওয়া জাহাজের শেষ টেরেডাক্টিল। পথে নামতেই এলো প্লাস্টিক পোড়া গন্ধ, অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ আর নিচে মিশে থাকা মৃত নদীর আর্তনাদ। বুড়িগঙ্গার শেষ নিশ্বাস, যেন মৃত্যুপথযাত্রী এক কুষ্ঠরোগী ।

পৌঁছতে বেলা আটটা বেজে গেল। ল্যাবের ডোর সেন্সর খুলতেই ভেসে এলো আরাফাতের উদ্বেলিত কণ্ঠ। 'আবির ভাই! এদিকে দেখো, কাল রাতের বৃষ্টির পানিতে মহাকাশযুদ্ধের দৃশ্য!' মাইক্রোস্কোপের নিচে টেস্ট টিউবটা ধরতেই নেচে উঠল রক্তলাল-নীল-সবুজ কণারা। ন্যানোপ্লাস্টিকের এই রাক্ষসের দল যেন ছুটছে অদৃশ্য কোনো শিকারের পিছনে।

'মহাকাশযুদ্ধ না, আরাফাত', বললাম আমি। টিউবটা আলোয় ঘুরিয়ে বললাম, 'এরা আমাদের ভেতরেরই যুদ্ধ। ২০৯০ সালে সমুদ্রে জন্ম নেওয়া 'প্লাস্টিস্ফিয়ার' আজ রক্তে-মজ্জায় 'প্লাস্টিবায়োম' বানিয়েছে। বৃষ্টির পানি থেকে রক্তের অস্থিমজ্জা, সবখানেই এখন ন্যানোপ্লাস্টিক কণার রাজত্ব।'

আরাফাত টেস্ট টিউব নাড়তে নাড়তে হাসল। সে হাসিতে ভেসে এলো ভয়, 'একটা থিওরি শুনবে, আবির ভাই? এই ন্যানো-রাক্ষসেরা ডিএনএ-এর গুহায় ঢুকে ক্রস-টক করবে একসময়! আগামী প্রজন্ম 'পলিগ্রোজেনি' সিনড্রোম নিয়ে জন্মাবে যাদের হাড় হবে পলিকার্বনেট, নার্ভ হবে PVC টিউব! হাহাহা!

ভদ্রতার খাতিরে হাসতে চেয়েও পারলাম না। ঠিক তখনি স্মার্টগ্লাসে ঝলসে উঠল ডব্লিউএইচও-এর রিপোর্ট: '২১০০ সাল থেকে মানবদেহ সপ্তাহে ৫ গ্রাম প্লাস্টিক শোষণ করছে একটি ক্রেডিট কার্ডের ওজন!' একটা কার্ড... যার একপিঠে স্বপ্ন, অন্যপিঠে মৃত্যু।

বিকেল তিনটা।

হঠাৎ ল্যাবে তীক্ষ্ণ সাইরেন! ডিজিটাল ম্যাপে জ্বলজ্বল করছে–'ফ্লুরোসেন্ট ট্রেসার সিগন্যাল ডিটেক্টেড : গভীর নলকূপে ৭-জি'। গত বছর বুড়িগঙ্গায় ছাড়া বায়োলুমিনেসেন্ট ট্যাগার এখন ভূগর্ভস্থ জলাধারে ঢুকে আমাদের চায়ের কাপে পৌঁছেছে! ড. নুবাহ্ হোলো-স্ক্রিনে ডেটা ঘুরিয়ে বললেন, 'দেখো এই টক্সিক সার্কিট! পানি শোধনের চেয়ে দ্রুত গজাচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক-রেজিস্ট্যান্ট সুপারবাগ। এরা নদীর তলদেশে জৈব-বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক বানাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে এক জীবন্ত বিষবৃক্ষ!'

তখনই স্ক্রিনে হঠাৎ নীল-লাল আলোর ঝলক! পিএম ২.৫ কণা আর ন্যানোপ্লাস্টিক জট পাকিয়ে 'টক্সিক ন্যানোবট' বানিয়েছে। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের স্ক্রিনে তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘুরছে, যেন বিষের ড্রোন বাহিনী! 'প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিচ্ছে রে ভাই,' আরাফাত চিৎকার করে উঠল। 'মানুষই তো তৈরি করেছিল এদের... এখন এরা আমাদের গিলে খাবে!' ল্যাবে নিস্তব্ধতা..

রাত দশটা ত্রিশ।

জানালার কাচ কেঁপে উঠল হঠাৎ। নিচ দিয়ে ম্যাগলেভ ট্রেন ছুটে গেল শব্দের দেয়াল ভেঙে, ১১০ ডেসিবেল!। স্মার্টওয়াচ জ্বলে উঠল-'কর্ণের সিলিয়া বিকল হওয়ার সম্ভাবনা : ৭২% - ব্যবহার করুন অডিও-ব্লকার'। ড. নুবাহ্ বললো, পাখিরা এজন্যই শহর ছাড়লো বুঝি!'

আমি বললাম 'পাখিরা শহর ছাড়ল কারণ তারা শুনতে পায় ইনফ্রাসাউন্ড। আমাদের ইঞ্জিনের নিম্ন কম্পাঙ্ক তাদের জন্য অদৃশ্য ছুরি। আমরা নিজেদেরই কানে বধির করে ফেলছি। পাখিরা তবুও শহর ছেড়েছে। আমরা তো তাও পারি নি।' ড. নুবাহ্-এর চোখে একরাশ হতাশা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়লো না।

রাত ১টা বাজে।

ল্যাবের ছাদে টেলিস্কোপটা ঠিক করতে গিয়ে হাত থেমে গেল। উপরে তাকিয়ে দেখলাম আকাশ বলতে যা আছে, তা তো 'ফোটোনিক স্মগ'-এ আচ্ছন্ন। নীল-সবুজে জ্বলজ্বল করা হোলোগ্রাফিক বিজ্ঞাপনগুলো একেকটা বিষাক্ত অগ্নিপিণ্ড। এই আকাশ দেখার কোনো অর্থই হয় না।

হঠাৎ পেছনে একটা মৃদু শব্দ শুনে ফিরে তাকালাম। ল্যাবের ক্লিনার শফিক ভাইয়ের ছোট মেয়ে রিনা এখনো ঘুমোয়নি। বাবার সাথে আকাশ দেখতে বেরিয়েছিল, বায়োফিল্টার মাস্ক পরে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা ছবি যেখানে আঁকা এক টুকরো নীল আকাশে উজ্জ্বল তারা, নিচে সবুজ গাছ, নদীর পানিতে সূর্যের প্রতিফলন। 'আঙ্কেল, এই ছবিটা দেখো?' রিনার কণ্ঠে কৌতূহল। 'বাবা বললেন যে একসময় নাকি পৃথিবী এ রকম ছিল? সত্যি?'

আমার গলা শুকিয়ে গেল। তার হাতে থাকা কল্পনার ছবিটা দেখে মনে হলো, সে যেন কোনো পুরাণের গল্প বলছে। সেই আকাশ? সেই নদী? সেই গাছ? এগুলো তো এখন আমাদের কাছে সায়েন্স ফিকশনের চেয়েও অবাস্তব। 'হ্যাঁ রিনা' আমি হাত বাড়িয়ে তার মাথায় হাত রাখলাম। মাস্কের ভেতর থেকে কথা বলতে গিয়ে স্বর কর্কশ হয়ে এলো, 'একসময় সত্যিই এরকম ছিল।'
'কিন্তু আঙ্কেল..., 'তার বড় চোখ দুটো প্রশ্নে ভরে উঠল, 'এখন আকাশে তো তারা নেই? তাহলে সেগুলো কোথায় গেল? কে নিয়ে গেল?'

রিনার সরল প্রশ্নটা বুকের ভেতর একটা ভারী পাথরের মতো আছড়ে পড়ল- 'কে নিয়ে গেল?' আমরাই তো। আমাদেরই লোভ, আমাদের অদূরদর্শিতা, আমাদের উন্নতির নামে লাগামহীন ধ্বংসযজ্ঞ।

আমি টেলিস্কোপের দিকে তাকালাম। যন্ত্রটা এখন শুধুই একটুকরো বেকার যন্ত্রপাতি, যার চোখ আমরা নিজেরাই অন্ধ করে দিয়েছি। তারপর রিনার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম, কণ্ঠে এক গভীর, অনন্ত বিষাদ আর একফোঁটা লজ্জা মিশে, 'তারারা যায়নি রিনা... তারা এখনো আছে। শুধু... আমরা তাদের দেখতে পাই না। আমাদের চোখের সামনে যে শৃঙ্খল, সেটা এতই ঘন, এতই ভারি যে তারার আলো আর তা ভেদ করে আসতে পারে না।'

রিনা কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইল সেই বিষাক্ত, বিজ্ঞাপনে ঝলমলে আকাশের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তাহলে... এই শৃঙ্খল কখন সরবে আঙ্কেল? কখন আমরা আবার আসল তারা দেখতে পাব?'
আমি কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। শুধু তার কাঁধে হাত রাখলাম; নিচে শহর থেকে ভেসে আসা বিষাক্ত বাতাসে হঠাৎ একটা মিষ্টি-তেতো গন্ধ লাগল, ন্যানোপ্লাস্টিকের গন্ধ। অদৃশ্য শৃঙ্খলের গন্ধ। যে শৃঙ্খল আমরা নিজের হাতে বুনেছি, আর যে শৃঙ্খলের নিচে চাপা পড়ে আছে রিনাদের ভবিষ্যৎ আর হারিয়ে যাওয়া নক্ষত্রের আলো।

জানালার কাঁচে হাত রাখলাম। একদম ঠান্ডা, নিষ্প্রাণ; ঠিক আমাদের ভবিষ্যতের মতো। মনে মনে বলতে লাগলাম, 'বেচারা তারাহারা প্রজন্ম... ওরা কি কখনো বুঝবে মহাবিশ্বের নিঃসীমতা? আমাদের ছেলেমেয়েরা হয়তো ভিআর চশমায় চাঁদ আর তারা দেখবে। কারণ? কারণ আমাদের নির্মিত এক অদৃশ্য শৃঙ্খল...'

শারদপ্রভা

আয়েশা আহমেদ রিদি
প্রভাষক
ডিপার্টমেন্ট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ

শাপলা হাসে হৃদয়জুড়ে
দীঘি, বিলের বুকে,
কাশফুল তো নদীর পাড়ে
একটুখানি ঝুঁকে।

গগনে নীল রঙিন আভা
নদীর জলের সনে,
অরণ্যে সতেজ উষ্ণতা বহে
চাঁদ-সুরুজের টানে।

শালুক হাসে, পদ্ম হাসে, হাসে বকুল ফুল,
বর্ষা হওয়া এসময় এক মস্ত বড় ভুল।

শিশির পড়ে কচি ঘাসে
ভেজা গাছের ডালে,
খঞ্জনা তো ইতি টানে
তন্দ্রা,স্বপ্নজালে।

জ্যোৎস্নাভরা রাতে যখন
চন্দ্র আড়াল হয়,
ওপার হতে মেঘ ডেকে তার
মনের কথা কয়।

এমন সময় ভুবনভরা একটা
বারই আসে,
এই বাংলায় ছদ্মনামে
শারদপ্রভা বেশে।

মনন

নাকিব জামান
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব এনভায়রনমেন্টাল সাইন্স

আঁধার-কালো মেঘ দেখে, যায়নি খোকা ইস্কুলেতে,
দাদু ওই বারান্দাতে, গল্পে এবার উঠবে মেতে।
গল্প–যে নয় সত্য কথা, শুনেছ কি মেঘের ডাক?
টিনের চালে জলের ফোঁটা, একনাগাড়ে পড়ত যেথা।
কী মধুর বাজনা সে যে, মনকে রাখি কেমনে বেঁধে–
ছুটতাম তাই বন-বাদাড়ে, খেলার-সাথি সঙ্গে করে।
যেতাম মাঠে, নদীর ধারে, পুরোনো সেই বৃক্ষতলে,
কুড়াই ফল ইচ্ছেমতো, হাত বাড়িয়ে দেয় যত।
সাঁঝের বেলায় ফিরি নীড়ে, সারা-বাজার-গ্রাম ঘুরে,
মায়ের বেত পড়ত কষে; সর্দি-কাশি বাঁধত শেষে।
তবুও তো শান্তি ছিল, শরীর-মনে শক্তি ছিল–
ঝাপসা চোখে দেখি আজও, সেদিন কত সুখের ছিল।

মৃত্যু

মোহাম্মাদ ইলিয়াস কবির
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব ইংলিশ

গভীর নিস্তব্ধ নিশীথে হঠাৎ শুনি- কুকুরের ঘেউ ঘেউ চিৎকার,
মন আমার মলিন হয়েছিল, আত্মা যেন দিচ্ছিল নিগূঢ় হুংকার।
হাতে ছিল বল, বুকে ছিল শ্বাস- কেমন কীসের যেন কমতি?
উষা কি চক্ষু দেখবে আর? এখন কাকে করব শেষ মিনতি?
বাহিরে কি এখন অমাবস্যা? নাকি ফুটফুটে চাঁদের আলো?
এত প্রশ্ন আমি কাকে করছি? কেন হচ্ছে সব এলোমেলো?

হাত-পা সব অসাড় হয়ে মস্তিষ্ক ধীরে হারাচ্ছে তার ক্ষমতা,
দম কেন এখন কমে যাচ্ছে? নাকি এই সব মোর দীনতা!
স্বপ্ন কি এত ভয়ংকর হয়? কোন বল যে পাচ্ছি না দেহে,
আমি কি কোথাও চলে যাচ্ছি! কে ডাকছে তাঁর মোহে?
'আমাকে ছাড়ো, কে তুমি! কেন এভাবে দেখাচ্ছ ভয়?
লড়াই করে পারব না আমি তোমাকে করতে জয়?'

হঠাৎই আমি নিজেকে হারাই, চাই ফিরে পেতে মোর দেহটি,
অমনিতে যেন নীরব দেহ, পায় দেখা এক প্রকাণ্ড আলোটির।
কে যেন শুধু স্পর্শ দিচ্ছিল! আর ডাকছিল তার জগতে!
তার অসীম ভারী হাতটি যেন পীড়া দিচ্ছিল হৃৎপিণ্ডতে।
চিৎকার করি, দাঁড়াতে চাই, কিন্তু কেউ শুনেছিল না আমায়!
কেন ওরা আজ এমন করছে? এভাবে কি কেউ ঘুমায়?

এ যেন এক অসহ্য যন্ত্রণা বিষ বিধেঁছিল সব শিরায়,
মলিন মুমূর্ষের শেষ ধাপে আমি- বলছিল কাতর আত্মায়।
হঠাৎ বিষের মূর্ছনা শেষে ভেসে আসছিল যেন এক অদ্ভুত সুর,
যেই সুরে কিনা সন্দেহ নেই, পাথর ভাঙাও লাগে মধুর।
শক্ত শিকল ছাড়ল আমায়, পেয়েছিলাম সেদিনের মুক্তি,
শেষ শর্বরীর ওই সুর-ই আমার পক্ষে দিচ্ছিল যুক্তি।

অতঃপর ঠিকই শুনলাম আমি- আমায় ডাকছে তাঁর করুণায়,
যেই ডাকুক আর যেই বলুক, নীরব শান্তি যে তাঁর আশায়।
মুমূর্ষের হাসি ডিঙিয়ে আমি যেই সুরে পেলাম নিজেকে,
ওই শান্ত শীতল সুর-ই যেন আমাকে পারে সাজাতে।
মমতাপূর্ণ ওই বাণী বলছিল-আমার নয় সে শত্রু,
একমাত্র তার সেদিনের বাণী-হারিয়েই দিয়েছিল মৃত্যু!

গাছের অব্যক্ত কথন

মো: মশিউর রহমান অন্তর
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

'গাছ' বলে আমাদের আর কত অত্যাচার করবে ভাই?
এ ভুবন তোমাদের একার নয়; আমাদেরও আছে ঠাঁই।
গাছেরও জীবন আছে-তবুও মানুষ কেন ভুলে যায়?
হে মানুষ একটু সুযোগ দিয়ো;
তোমাদের আশীর্বাদের জন্য বেঁচে থাকতে চাই।
হে মানবজাতি, তবুও যদি আমাদের না বুঝো;
তাহলে পড়ো তোমরা জগদীশ চন্দ্র বসুর অব্যক্ত গ্রন্থ,
দূর হলেও হতে পারে তোমাদের মস্তিষ্কে থাকা ভ্রান্ত।

মাঝে মাঝে মনে হয়-
যদি প্রতিটি মানবজাতির ভেতর থাকত ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্র।
হয়তো তারা একটু হলেও অনুধাবন করতে পারত
মানুষের মত গাছেরও আছে প্রজনন ও জীবনচক্র।

হে মানবজাতি, তবুও যদি সন্দেহ থাকে তোমাদের মনে
তাহলে খুলে দেখো আল্লাহর পবিত্র বাণী ক্ষণে ক্ষণে।
পড়ো তুমি পবিত্র কোরআনের সুরা আনআম ও নাহল,
জানতে পারবে উদ্ভিদের বৈচিত্র্যময় সুফল।
যদি ইচ্ছা হয় আরও জানার,
পড়ো তুমি বেদ ও পুরাণ।

হে মানবজাতি, আমরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করি,
জীবদের বসবাসের জন্য সুন্দর পরিবেশ গড়ি,
তোমাদের অক্সিজেন প্রদানসহ নানান উপকার করি।
তবুও তোমরা গাছকে কেন দাও কষ্ট?
জবাব দাও; কেন করছ বৃক্ষ নিধনে পরিবেশ নষ্ট?
কেন করছ তুমি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধি?
ক্ষণে ক্ষণে পৃথিবী হারাচ্ছে ভারসাম্য-পরিধি!

জবাব দাও;
সৃষ্টির সেরা জীব হয়েও কীভাবে করছ এমন ভুল?
অদূর ভবিষ্যতে তোমাদেরই দিতে হবে এই ভুলের মাশুল!

আমি নারী

সোহানা আক্তার রিয়া
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব সোশিওলজি

তোমরা যারা ব্যাখ্যা করেছ-'নারীবাদী' হলো সে-ই
লাজ-লজ্জা, নম্রতা আর শালীনতা যার নেই।
না, আমি তোমাদের মনগড়া 'নারীবাদী' নই,
শত-সহস্র বাধা পেরিয়ে আমিই এগিয়ে রই!

আমি তোমাদের 'নারীবাদী' নই!
যে হাতে বিদ্যার্জনে কলম ধরি আমি,
সে হাতেই দেশের পতাকা নিয়ে রাজপথে নামি আমি,
মুক্ত আকাশে স্বাধীন সুখে বিহঙ্গ হয়ে উড়ি,
পুরো বিশ্বকে দেখব আমি-সেই স্বপ্ন গড়ি।
আজ যে নারী স্বপ্ন দেখে বিশ্বকে জয় করবার,
আপন বলে বলিয়ান সে, ছিনিয়ে নিবে অধিকার।

মনে রেখো-আমি নারী,
স্বপ্নচোখে লক্ষ্য নিয়ে জীবন গড়তে চাই,
স্বাধীনভাবে এই বাংলায় পথ চলতে চাই।
নবপ্রভাতের আলোয় রাঙা সূর্য হতে চাই!

কাছে লোকে কিছু বলে

মোরসালিন মাহফুজ
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব সোশিওলজি

করিতে পারি না পাশ
সদা ভয় সদা লাজ
সংশয়ে সিটি-মিড সদা টলে
ফাইনালে সিপিপিএ দেখে মাথা দোলে।

গেট দিয়ে গোপনে ঢুকি
আড়ালে নিজেকে ঢাকি
এই বুঝি গার্ড মামা ধরে ফেলে
আজ ফরমাল পরি নাই বলে।

হৃদয়ে ধুকধুক মতো
উঠে ভয় কত শত
হঠাৎ সালাম দিতে ভুলে গেলে
'সবাইকে মাঠে ডাকছে' সিআর এসে বলে।

পিছনের মনিটরে চেয়ে থাকি
স্যুট-বুট পড়ে হাঁটু কাঁপা কাঁপি
'ফ্লোর ইজ ওপেন'-স্যার বলে
বন্ধুরা মজা নেয় প্রশ্ন করার ছলে।

একটি বিশ্বাসের কথা
মামা, আজ পরীক্ষায় একটু দেখা
আর দেখব না কাল থেকে
এভাবেই সেমিস্টার যায় চলে।

নতুন সেমিস্টার শুরু
মনটা বেশ উড়ুউড়ু,
কারণ ক্লাস শেষে বিকেলে
মনপুরায় পাখিদের দেখা মেলে।

এইভাবে দিন কেটে যায় বেশ
চোখের পলকে স্নাতক হলো শেষ
চারটি বছর কাটিয়েছি হেসে-খেলে
বিদায় বিইউপি! আমাদের যেয়ো না ভুলে।

দ্রষ্টব্য : রম্যরচনা, কবি কামিনী রায়-এর লেখা 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে 'কাছে লোকে কিছু বলে' (প্যারোডি) কবিতাটি লেখা হয়েছে।

মিতালি

ফারদীন-ই-হাসান ফুয়াদ
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব মাস কমিউনিকেশন্স অ্যান্ড জার্নালিজম

এই গান, এই কথা, কবিতার সুর
ভেসে আসে কোথা থেকে হায় কী মধুর!
কাছাকাছি জানি আছি ভয় নেই তোর,
আয় তোরা একসাথে জীবন মেদুর!

আলপনা এঁকে চলে সাগরের জল
হেথা-সেথা ফুটে ওঠে শত শতদল,
আকাশের ধুলো জমা মেঘেদের দল
আয় তোরা একসাথে মিলি সবে চল!

সুনীল ও আকাশ আর সবুজের টান
মিশে গেছে সীমানাতে পাহাড় সমান।
শিশিরের ঘুম ভাঙে, শিউলির ঘ্রাণ
আয় তোরা একসাথে বুক ভরা প্রাণ!

ঝিলমিল কেলি করে রৌদ্রের জল
হাসিমুখে ছেয়ে যায় এই প্রাঙ্গণ;
রংধনু নেমে আসে রঙের মহল
আয় তোরা একসাথে মিলি সবে চল!

CADENCE

ANNUAL MAGAZINE 2025

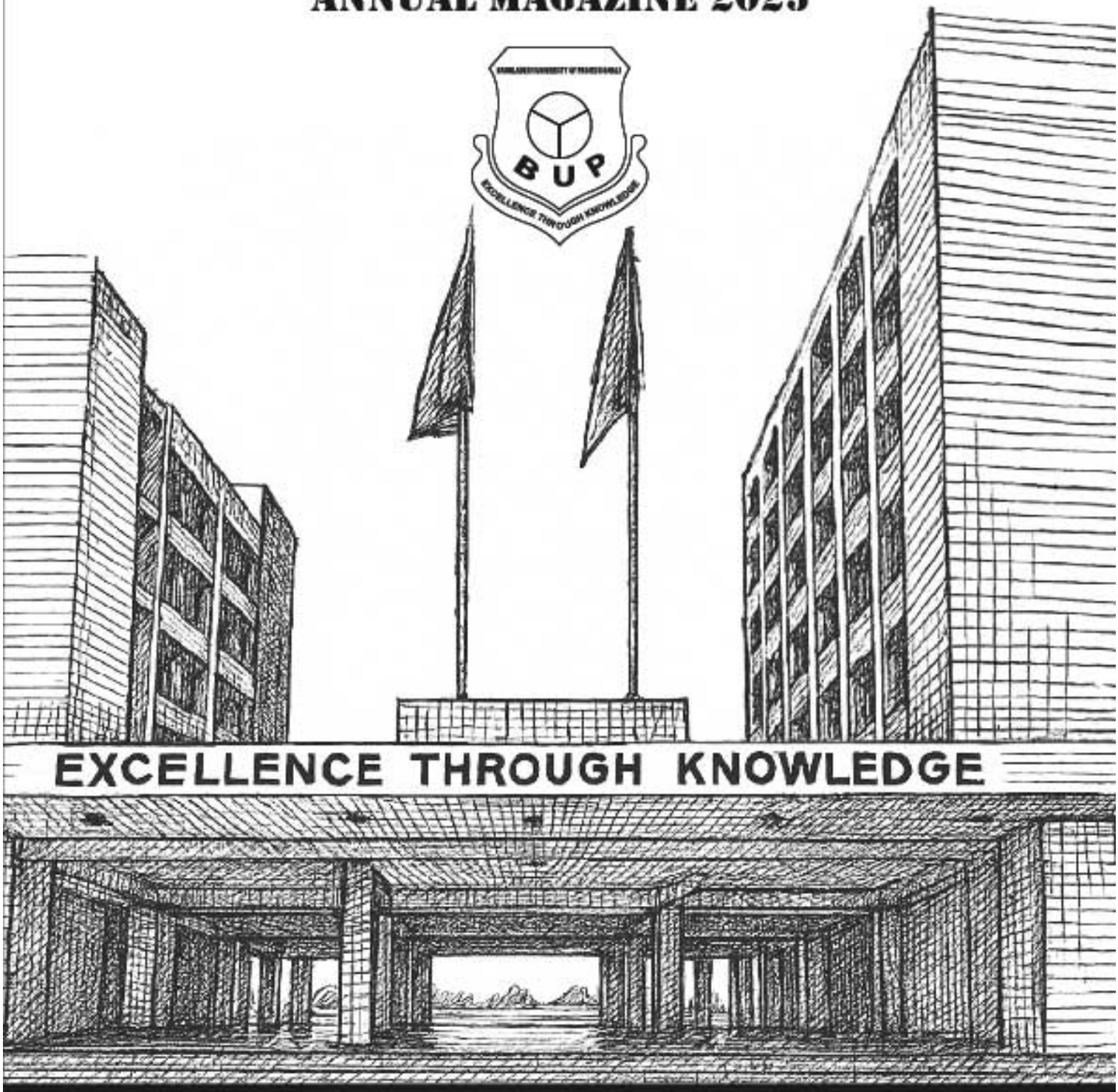

BANGLADESH UNIVERSITY OF PROFESSIONALS
Mirpur Cantonment, Dhaka-1216
www.bup.edu.bd